ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা নাটকে জাতীয় জরুরি অবস্থার পটভূমি

বাংলা নাটকে জাতীয় জরুরি অবস্থার পটভূমি

ভারতের সমাজ-জীবনে জরুরি অবস্থার (১৯৭৫-১৯৭৭) সময়পর্ব জনগণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হরণ করার এক নগ্ন কৌশল। এই সময়পর্ব দেখেছে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, সেনসরের তীব্র দৃষ্টি এবং শুনেছে উন্নতির ঢক্কানিনাদ। সমাজের মেরুদণ্ড যে বুদ্ধিজীবীরা—তাঁদের এক শ্রেণিকে দেখা গেছে ক্ষমতার চাটুকারিতা করতে, আবার তার বিপরীতে আরেক শ্রেণি করেছে তীব্র প্রতিবাদ। প্রতিবাদ করার মাশুলও তারা চুকিয়েছেন কখনও গ্রেপ্তার হয়ে, কখনও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে। প্রচারের অন্যতম মাধ্যম পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন, আকাশবাণী ইত্যাদিকে শাসকগোষ্ঠী করায়ত্ত করেছে। ব্যবহার করেছে নিজেদের রাজনীতির স্বার্থ সিদ্ধিতে। এই জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে তার অন্ধকারময় দিকগুলিকে তুলে ধরে বাংলায় বেশকিছু নাটক রচিত হয়েছে। সেই নাটকগুলিতে বিধৃত হয়েছে জরুরি অবস্থায় সাধারণ মানুষের যাপন চিত্র, দর্শিত হয়েছে শাসকের স্বৈরাচারী রূপ, সমালোচিত হয়েছে তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা দেশে শিক্ষিত মানুষ, বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমর্থন সমস্ত শাসকই চেয়েছে সর্বকালে নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে। সেই চাওয়াকে বাস্তবরূপ দিতে ছল-বল-কৌশল তিন উপায়ই শাসকরা অবলম্বন করে থাকেন। আর শাসকের কোনও সিদ্ধান্তের উপর স্বৈরাচারী তকমা লাগার সম্ভাবনা হলে সমাজের প্রথম সারির শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় শাসকের অধিক তৎপরতা লক্ষ করা যায়। জরুরি অবস্থার সময়েও তৎকালীন কংগ্রেস শাসকের অনুরূপ তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। প্রসিদ্ধ চিত্রকর মগবুল ফিদা হুসেন ২৬ জুনের আগে ও পরের ভারতবর্ষকে বিষয় করে তিনটি চিত্র অঙ্কন করে ইন্দিরা গান্ধিকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই চিত্রগুলির একটিতে ইন্দিরা গান্ধিকে দেখানো হয়েছে সীতারূপে, একটিতে দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনীরূপে[১], লেখক খুশবন্ত সিং নিজের সম্পাদিত পত্রিকা 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া'-তে সঞ্জয় গান্ধিকে 'Man of the Year' ঘোষণা করেছেন। লিখেছেন 'গভীর নিদ্রা ভেঙে ভারতীয়দের জাগিয়ে তুলেছিলেন মাতা;

তাদের কর্মচঞ্চল করে তুললেন সঞ্জয়'।[২] জরুরি অবস্থা ঘোষণার পনেরো দিন আগে সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিল্পী ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় দুশো মতো বুদ্ধিজীবী একটা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বিবৃতি প্রকাশ করেন। যেখানে ইন্দিরা গান্ধিকে প্রগতিশীল দেখানো হয়। তাঁদের মতে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন ফ্যাসিবাদী ছিল। জরুরি অবস্থার ঘোষণায় এঁরা উল্লাস বোধ করেছিলেন।[৩] তা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন বেশকিছু বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক ছিলেন যাঁরা শাসকের সঙ্গে আপোষ করেননি। বরং শাসককে দফায় দফায় আলোচনা করতে দেখা গেছে সমর্থন আদায়ের তাগিদে। যেমন ইন্দিরা গান্ধি মার্চ ১৯৭৬-এ কলকাতায় এসে কবি সাহিত্যিক, মঞ্চ ও চলচিত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শম্ভু মিত্র, শোভা সেন, বিভাষ চক্রবর্তী প্রমুখ।[৪] এই আলোচনার অবশ্য মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল তাদের সমর্থন আদায় করা এবং তাদের প্রতিবাদ স্তব্ধ করার একটা প্রয়াস।

যেখানে আলোচনা কাজে দেয়নি সেখানে চেপেছে সেনসর, নেমে এসেছে স্বৈরাচারের অশনি সংকট। পত্র-পত্রিকা, অন্যান্য রচনা, গণআন্দোলন ইত্যাদি শাসক বিরোধী কাজকর্মের পাশাপাশি থিয়েটার ও নাটকের উপরও নিষেধাজ্ঞা ও আক্রমণ নেমে এসেছিল। ১৮৭৬ সালের ব্রিটিশ সরকার কৃত 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন' চেপে বসেছিল ১৯৭৫-৭৬ সালের দিনগুলিতে। ১৯৭৫-এর ডিসেম্বরে নাটককার অমল রায়ের উপর সশস্ত্র গুন্ডা হামলা করেছিল। ১৯৭৬ সালে সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল। সে বছরই নাট্যদল 'নটতীর্থ' কর্তৃক 'নিজবাসভূমি' অভিনীত হলে পুলিশ এসে হাজির হয়; আবার অমল রায়ের 'গেব্রিয়েল পেরী' নাটকটির উপরও পুলিশের কুনজর পড়ে। নৈহাটিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের পালারূপ অভিনয় করার সময় 'মুকুন্দদাস যাত্রাসমাজ' আক্রান্ত হয়েছিল। এছাড়াও হাওড়ার শিবপুরে 'ব্যঞ্জনা' নাট্যসংস্থা কর্তৃক 'দিন আসবেই', বসিরহাটে 'লাশবিপণি', শ্রীরামপুরে 'রক্তের জোয়ারে শুনি' নাটকগুলি মঞ্চায়নের সময় নানাভাবে আক্রান্ত হয়েছিল।[৫] এতকিছুর পড়েও নাটককারদের শৈল্পিক সত্তাকে বোতলবন্দি করতে পারেননি তৎকালীন শাসকশ্রেণি। নাটককারেরা নাটক লিখেছেন এবং তাতে নানাভাবে জরুরি অবস্থার ব্যাখ্যা

ও প্রতিবাদ করেছেন। এখানে কিছু নাটকের আলোচনার মাধ্যমে তা দেখানো যেতে পারে।

বাংলা পলিটিক্যাল থিয়েটারের একনিষ্ঠ সেবক উৎপল দত্ত স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতিতে স্বৈরাচারের সর্বোচ্চ শিখর জরুরি অবস্থায় যে চুপ করে থাকবেন না সেটাই স্বাভাবিক। অবশ্য তিনি মনে করতেন জরুরি অবস্থা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তেমন আচমকা কোনও বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। কারণ তাঁর মতে ১৯৭১ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক হিংসার আগ্রাসন এবং পুলিশের দমন চলেছিল তা একরকম জরুরি অবস্থার বাতাবরণেরই অনুরূপ।[৬] জরুরি অবস্থায় কেবল তার মাত্রা বেড়েছিল। সেজন্যই তিনি বাংলার রাজনীতিতে জরুরি অবস্থাকে কোনও বিক্ষিপ্ত পরিসরে দেখেননি। তাঁর নাটকগুলিতেও সেই ভাবনা দেখা গেছে। জরুরি অবস্থায় ফ্যাসিবাদী উত্থানকে মাথায় রেখে তিনি কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। সেসব নাটকে শাসকশ্রেণির ক্ষমতার আস্ফালনকে যেমন স্থান দিয়েছেন, তেমনি সর্বগ্রাসী ক্ষমতার চোখরাঙানির প্রতিবাদও করেছেন। নাটককে হাতিয়ার করে জরুরি অবস্থার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। গণতন্ত্র বিনষ্টকারী শাসকশ্রেণির জনসেবাময়ী মুখোশ টেনে খুলেছেন।

২৬ জুন ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থা জারি হলে ২৭ সেপ্টেম্বর 'রবীন্দ্রসদন'-এ 'পিপলস লিটল থিয়েটার গ্রুপ' শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' মঞ্চস্থ করে।[৭] এর সম্পর্কে ১৯৮৯ সালে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত বলেছিলেন—

> 'শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ যখন আমরা করলাম, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ-এর চেয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে better play হতে পারে না। এমারজেন্সি-র বিরুদ্ধে এত ভালো নাটক আর নেই। এখনও পর্যন্ত লেখা হয়নি। কিন্তু আমরা জানতাম যে, এটা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর এমারজেন্সির বিরুদ্ধে নাটক, সেটা ধরার মত বুদ্ধি কংগ্রেসিদের নেই। ম্যাকবেথ করলে ওরা বলবে যে এদল শেক্সপিয়ার সাধনায় মগ্ন আছে, এদেরকে কিছু বোলো না। তাই হল। ম্যাকবেথ-কে ওরা কোনো বাধা-টাধা দেয়নি।'[৮]

অনুবাদ নাটক ছেড়ে দিলেও উৎপল দত্তের কয়েকটি মৌলিক নাটকে এসেছে জরুরি অবস্থার পটভূমি।

লেনিন কোথায়?:

লেনিনকে বিষয় করে দেশের বিভ্রান্তিকর দুরকম রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুটি নাটক উৎপল দত্ত রচনা করেছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার পর তার অন্তর্গত বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি যখন নিজেদেরে মধ্যে সংশয়, সন্দেহ, কলহে জর্জরিত ছিল তখন তিনি রচনা করেন 'লেনিনের ডাক' (১৯৬৯)। যেখানে স্থান পেয়েছিল ১৯১৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার জনগণ যেভাবে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণি, দুর্ভিক্ষ, বিদেশী আক্রমণকারী ফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিজয় হাসিল করেছিল সেই বিষয়টি। আর দেশের অন্ধকারময় জরুরি অবস্থার সময় তিনি রচনা করলেন 'লেনিন কোথায়?' (১৯৭৬)। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> '...পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে শাসক কংগ্রেস সরকার দেশে জরুরী অবস্থা জারী করে এবং সর্বপ্রথম আক্রমণ নেমে আসে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর; বামপন্থী নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন এবং বিপ্লবী সংস্কৃতিচিন্তা সংগঠনগুলির ওপর ব্যাপক হামলার ফলে নেমে আসে সন্ত্রাসের কালো ছায়া। এই পরিস্থিতি স্মরণ রেখে উৎপল দত্ত লেখেন 'লেনিন কোথায়?' প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় দুর্বিষহ শোষণ ও দমনপীড়নের মুখে বল্‌শেভিক পার্টির কর্তব্য সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের নির্দেশিত পথের নিশানা তুলে ধরা হয়েছে ঐ নাটকে।'[৯]

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ায় বুর্জোয়াদের দ্বারা সংগঠিত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে জার শাসনের পতন ঘটে এবং আলেকসান্দর ফিওদোরিচ কেরেনস্কি-এর অধীনে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় লেনিন ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে। বিপ্লবের পর তিনি রাশিয়ায় ফিরেন ৩ এপ্রিল। বুর্জোয়া বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণিকে তার সম্পূর্ণ অধিকার দেয় না। দেশের পুঁজিবাদী শ্রেণি দ্বারা তা পরিচালিত। ফলে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তখনও প্রয়োজন ছিল আর একটি বিপ্লবের। পরবর্তীতে রাশিয়ায় সংগঠিত

হয় অক্টোবর (নভেম্বর) বিপ্লব। প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় রাজনৈতিক দমন-পীড়ন ও দুর্বিষহ শোষণের মধ্যে বলশেভিক পার্টির কর্তব্য কী হবে—সে সম্বন্ধে ৪ এপ্রিল ১৯১৭ সালে বলশেভিক পার্টির মিটিং-এ এক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন লেনিন। এই ব্যাখ্যা ৭ এপ্রিল ১৯১৭ সালে 'প্রাভদা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যা 'এপ্রিল থীসিস' নামে পরিচিত। উৎপল দত্ত 'লেনিন কোথায়?' নাটকের বিষয়বস্তুতে অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্-মুহূর্ত ও 'এপ্রিল থীসিস' অবলম্বন করেছেন। নাটকের 'পূর্বরাগ'-এ শ্যামল এই পটভূমিকেই স্পষ্ট করেছেন—

> '...এটা পেত্রোগ্রাদ, জুলাই ১৯১৭—তাই বড় বড় নায়কের, গোয়েন্দার, ডিটেকটিভের, খুনীর একদম অভাব হবে না। গত দুদিন ধরে পাঁচ লক্ষ সশস্ত্র শ্রমিক অনবরত মিছিল করছে রাস্তায়। রুশিয়ায় প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বিদ্রোহে উন্মুখ!'[১০]

নাটকের কাহিনি বিশ্লেষণ করে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে এবং তার সঙ্গেই দেখা যেতে পারে ভারতের জরুরি অবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্ক ও গুরুত্ব।

যাত্রার আঙ্গিকে রচিত নাটকটির পটভূমি, কাহিনি ও চরিত্র সমস্তই যেহেতু বিদেশি সেহেতু নাটককার প্রথমেই সমস্ত চরিত্র এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর গঠিত রাশিয়ার মেনশভিক সরকারের সদস্যদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন শ্যামলের মাধ্যমে। প্রথম দৃশ্যেই স্পষ্ট করেছেন রাশিয়ার সংকটময় পরিস্থিতির কথা। অনেকগুলি ছোট ছোট দল একসঙ্গে জোট বেঁধে মেনশেভিক গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করে। কিন্তু ইনোকেন্তি আউয়েরবাখ-এর মতো শিল্পপতি ব্যক্তিদের অঙ্গুলি হেলনে সেই সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকার একের পর এক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে। পুঁজিপতিদের শোষণে দেশে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। খাদ্যের দাম তিন মাসে দ্বিগুনে পৌঁছায়। কারণ আউয়েরবাখের মতো পুঁজিপতিরা সমস্ত খাদ্য গুদামে মজুত রেখে কালোবাজারিতে মদত দিচ্ছে। ফলে বলশেভিকদের প্রভাব রাশিয়ার জন-জীবনে ক্রমশ বেড়েছে। দেশজুড়ে চলছে রাজনৈতিক উপদলীয় কলহ। সেই কলহে জড়িত বিভিন্ন গুন্ডাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করলে তারা তৎক্ষণাত ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে মন্ত্রীদের নির্দেশ বলে। কারণ বলশেভিকরা বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যাদের নেতা হচ্ছে লেনিন। তাদের

দমন করতে পুলিশের পাশাপাশি গুন্ডাদেরও বিশেষ প্রয়োজন। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণি বিপ্লবের বাতাবরণ তৈরি করেছে। তাই সকল বুর্জোয়া শ্রেণি চায় লেনিনকে আটক করতে। কিন্তু লেনিনের বর্তমান ঠিকানা কারও জানা নেই। সেজন্য তারা একদিকে সামরিক শক্তি দ্বারা স্কোবেলেভের সাহায্যে লেনিনের অনুসন্ধান করে এবং অপরদিকে পত্র-পত্রিকায় লেনিনের নামে কুৎসা রটনা শুরু করে এই বলে যে, সে জার্মানদের টাকা খেয়ে গুপ্তচর হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় বলশেভিকদের দপ্তর আক্রান্ত হচ্ছে, সদস্যরা মার খাচ্ছে। এসব নিয়ে 'প্রাভদা' পত্রিকার দপ্তরে লেনিন, স্তালিনদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে এমন সময় স্কোবেলেভ সেখানে এসে হাজির হয়—উদ্দেশ্য লেনিনকে ধরা। কিন্তু সেই অভিসন্ধি লেনিনরা বুঝতে পেরে সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন। স্কোবেলেভের নির্দেশে পত্রিকার দপ্তর ভেঙে দেওয়া হয়। অবশেষে একটি ফোনে তারা জানতে পারে শ্পালেরনায়া সড়কে লেনিনরা যাবে। স্কোবেলেভ বুঝে যায় লেনিন সেখানে ভোইনভের বই-এর দোকানে উঠবে। স্কোবেলেভ লেনিনের সমস্ত গতিবিধি ভাল করেই জানে। কারণ একসময় সে আর লেনিন একই পার্টিতে ছিল। মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে আজ তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বনকারী। স্কোবেলেভ মনে করে তাদের মতো মেনশভিকরাই প্রকৃত কমিউনিস্ট। তারা সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর আস্থা রেখে দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

শ্পালেরনায়া সড়কে জনগণের সামনে মেনশভিক সরকারের ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী চের্নভ বক্তৃতা রাখতে গেলে লিজার মতো সাধারণ শ্রমিকের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। একদিকে মেনশভিক সরকার নিজেদের জনগণের সরকার বলে দাবি করে, কিন্তু অপরদিকে আইন করে বোনাস বন্ধ করে দেয়। লিজার সংলাপে উঠে আসে শ্রমিকদের দুর্দশার কথা। তার দুই সন্তান চাকরি খুইয়ে বেকার, বাজারে জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, সংসার খরচ বার করতে নাজেহাল অবস্থা ইত্যাদি। একদিকে সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক-সামাজিক মানের অবনমন ঘটছে, অপরদিকে সরকার জাতীয়তাবাদের হাওয়া ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। লিজা নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যখন লেনিনের বিরুদ্ধে মেনশভিকদের যাবতীয় অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে শ্রমিকদের একাংশ লেনিনকে জার্মানের গুপ্তচর ভাবতে শুরু করেছে তখন তাদের এই ভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে লিজা বলেছেন—

'...এদেশ কি তোর? তুই তো বেকারের বাচ্চা বেকার, খেতে না পেয়ে এই শ্পালেরনায়া সড়কের ধুলো চাটছিস। দেশটা তো বড়লোক মজুতদারদের। লেনিন যদি ওদের সব্বোনাশ করে থাকে তো বেশ করেছে। ভারি আমার শালা দেশপ্রেমিক এলেন। লাথি খেলেও শালারা দেশের বুলি ছাড়ে না। চোখ দুটো মেলে একটু তাকা—দেখবি দেশ আর তোর নেই, মজুতদার আর মালিকেরা কেড়ে নিয়েছে।'[১১]

কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় ইতিমধ্যে লেনিনের সন্ধানে স্কোবেলেভ সহ আলেকসেইয়েভ প্রহরী নিয়ে শ্পালেরনায়া সড়কে এসে হাজির হয়। কিন্তু লেনিনরা সেখান থেকেও পালিয়ে যায়। যার বই-এর দোকানে লেনিনের ওঠার কথা ছিল সেই ভোইনভের সন্ধান পায় স্কোবেলেভরা। ভোইনভের যেহেতু লেনিন এবং বলশেভিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত সেহেতু শাস্তি হিসেবে সঙিন গেঁথে তাকে হত্যা করে মেনশভিকরা।

শ্পালেরনায়া সড়ক থেকে পালিয়ে পুতিলভ কারখানার মজদুর সের্গো আলিলুইয়েভের দারিদ্র্য বিধ্বস্ত ঘরে লেনিন ও তার সঙ্গীরা গা-ঢাকা দিয়েছে। এখানে তাদের কথোপকথনে উঠে আসে সরকারের বেশকিছু কর্মসূচির ভ্রান্ত দিক। রাষ্ট্রীয়করণ নীতির সমালোচনা করা হয়েছে। সরকার রাষ্ট্রীয়করণ নীতিকে যতই জনগণের হিতের পক্ষে বলুক না কেন, আসলে তা পরোক্ষভাবে বুর্জোয়া শ্রেণিরই করায়ত্ত। কারণ রাষ্ট্রটাই আসলে বুর্জোয়াদের অধীনে। তাই লেনিনের মুখে শোনা যায়—

'...ওদের রাষ্টীয়করণ মানে কিছু সরকারি আমলা এনে কারখানার ওপর বসিয়ে দেয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ারা এসে সেই আমলাদের ঘুষ দিয়ে হাত ক'রে নেয়। রাষ্ট্রায়ত্ত মানে হওয়া উচিত কারখানার শ্রমিকদের হাতে কারখানার নিয়ন্ত্রণ। অন্যথায় কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম চলবে—রাষ্ট্রীয়করণের ছদ্মবেশে।'[১২]

সের্গে ভাসিলিয়েভ সেখানে উপস্থিত হলে স্তালিনরা জানতে পারে ভোইনভের খুন হয়েছে, লেনিনের বর্তমান ঠিকানা স্কোবেলেভরা জেনে গেছে। সুতরাং লেনিনের ঠিকানা পুনরায় বদলানো আবশ্যক। তাই পরবর্তীতে চাষীর ছদ্মবেশে লেনিন ও জিনোভিয়েভের যথাক্রমে ইভানভ ও শিংগারেভ ছদ্মনামে আত্মগোপনের ব্যবস্থা করা হয়। লেনিনের স্ত্রী নাদেঝদা

ক্রুপস্কায়া ছাড়া বাকিরা সেখান থেকে প্রস্থান করে। তারপর লেনিনের সন্ধানে সেখানে স্কোবেলেভ সহ প্রহরীগণ পৌঁছে লেনিনকে না পেলে সামরিক আইনের বলে নাদেঝদাকেই গ্রেপ্তার করে। স্কোবেলেভের সংলাপেই জানা যায় দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে মেনশেভিক সরকার জরুরি অবস্থা জারি করেছে। স্কোবেলভ উদ্ভট যুক্তি দিয়ে বলেছে—

> '...যেহেতু এটা গণতান্ত্রিক সরকার সেহেতু দক্ষিণপন্থী সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে অগণতান্ত্রিক পথ ধরেই এ গণতান্ত্রিক। অর্থাৎ লেনিন যেহেতু দক্ষিণপন্থীদের হাত জোরদার করছেন সেহেতু গণতন্ত্র। মানে এখন গণতন্ত্র থাকা মানেই গণতন্ত্রের সর্বনাশ। সুতরাং অগণতন্ত্রই এখন অগণতন্ত্রকে রুখবার পথ। মানে—আপনি তো সবই জানেন কি আর বলব—এখন গণতন্ত্রই অগণতন্ত্র বা অগণতন্ত্রই গণতন্ত্র। মানে—জরুরি অবস্থা জারি ক'রে গণতন্ত্র ধ্বংস করছি গণতন্ত্রের স্বার্থে। গণতন্ত্র ধ্বংস না করলে গণতন্ত্রকে বাঁচান যায় না।'[১৩]

এর সঙ্গে যেন জরুরি অবস্থার পক্ষে ইন্দিরা গান্ধির দেওয়া বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়—

> 'In the name of democracy, it has been sought to negate the very functioning of democracy... How can any government worth the name stand by and allow the country's stability to be imperilled? The actions of a few are endangering the rights of the vast majority. Any situation, which weakens the capacity of the national government to act decisively inside the country, is bound to encourage dangers from outside. It is our paramount duty to safeguard unity and stability. The nation's integrity demands firm action.'[১৪]

নিমাইসাধন বসুকে দেওয়া সাক্ষাতকারেও তিনি জানিয়েছিলেন—

‘কংগ্রেস সরকার যদি চলে যায়, তাহলে একটা ঘোর বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেবে এবং গণতন্ত্র বলতে কিছু থাকবে না। মনে হল দেশটাকে একটা ঝাঁকুনি দেওয়া দরকার...দেশকে ঠিক পথে ফিরিয়ে এনে তার কর্তব্যের বিষয়ে তাকে সচেতন করতে চেয়েছিলুম।’[১৫]

সের্গে ভাসিলিয়েভের বাড়িতে লেনিন ছদ্মবেশে থাকলেও তাঁকে চিনে নিতে সময় লাগেনি নিকো, লিজাদের। এখানে তাদের সংলাপে উঠে আসে খাদ্যের অভাবে শ্রমিকদের দুর্দশার কথা। লিজা জানিয়েছে ভিবর্গ এলাকায় প্রতি সপ্তাহে অনাহারে লোক মারা যাচ্ছে। খাদ্যের জন্য জনগণের মনে একটা তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। সের্গে ভাসিলিয়েভের মতো বলশেভিকরাও মনে করে এটাই গণ-অভ্যুত্থানের যথাযথ সময়। সেই ধারণা ভেঙে দিয়ে বর্তমানের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেন লেনিন।–

‘খাদ্য পেলেই তারা কি মাথা নিচু করবে না? ক্ষুধার চোটে রেগে উঠেছে বলেই কি বিপ্লব সমাধা করার মত প্রতিজ্ঞা তাদের এসেছে? খাদ্যের নয়, বিপ্লবের ডাকে ক’জন আসবে? সেনাবাহিনীর মধ্যে আমাদের শক্তি কী? নাবিক ক’জন বলশেভিক আছেন? কৃষকদের মধ্যে কতটুকু শক্তি আমাদের? বলশেভিক শ্রমিক ফৌজের হাতে অস্ত্র কত? সোভিয়েতেই এখন আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হই নি।’[১৬]

কিন্তু এখান থেকেও লেনিনকে চলে যেতে হয়। কারণ তাদের এই ঠিকানাও মেনশভিকরা জেনে যায়। সের্গে ভাসিলিয়েভ যে মেনশভিক নয়, বলশেভিক—সেকথাও স্কোবেলেভ জানতে পারে। যার দরুন সের্গেকে গ্রেপ্তার করে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয় লেনিনের বর্তমান সন্ধান পাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু একনিষ্ঠ বলশেভিক হওয়ায় যক্ষা রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছে। লেনিনের সন্ধান সে দেয়নি। বলেনি রাজলিভে চাষীর ছদ্মবেশে লেনিন ও জিনোভিয়েভ আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে প্রহরী নিয়ে লেনিনকে গ্রেপ্তার করতে সেখানেও এসে হাজির হয় আলেকসেইয়েভ। তবে শেষপর্যন্ত চাষীর ছদ্মবেশে লেনিনকে তারা চিনতে পারেনা। অপরদিকে বলশেভিক পার্টির সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, ট্রটস্কির উপদল লেনিনের পার্টি

বলশেভিকদের এই লড়াইয়ে সমর্থন করেছে, মেনশেভিক সরকার নির্বাচন ঘোষণা করেছে এবং স্তালিন ও ট্রটস্কি উভয়েই নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছেন।

নির্বাচনে পুনরায় কেরেন্স্কি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তার কাছে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি কোনও কিছুই দেশের প্রধান সমস্যা নয়। লেনিনকে আটক করা এবং বলশেভিক সংগঠনকে ধ্বংস করাই যেন তার একমাত্র কাজ। কারণ তিনি মনে করেন দেশে যেহেতু জরুরি অবস্থা চালু আছে এবং বাইরে যুদ্ধ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) চলছে সেহেতু দুর্ভিক্ষের কথা শত্রুর প্রচারে সাহায্য করবে। তিনি এও মনে করেন যে জরুরি অবস্থাই সব সমস্যার একমাত্র সমাধান।

কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় পুঁজিপতিদের টাকায় কেরেনস্কিরা নির্বাচন জিতে সরকার গঠন করেছে ঠিকই, কিন্তু রাশিয়ায় সুস্থ সমাজ ফিরিয়ে আনতে, অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন ঘটাতে, দুর্নীতি দমন করতে পারেনি। অপরদিকে পুঁজিপতিরা অধিক পরিমাণে মুনাফা লুটে শিল্পকে অচল করে বেকারত্বের সমস্যা বাড়িয়েছে। ফলে দেশে বলশেভিকদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিক ফৌজ তো তাদের ছিলই, সেনাবাহিনীরও একটা বড় অংশ বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আবার সেনাবাহিনীদের অন্য অংশ কর্নিলভের নেতৃত্বে মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে দেশে মিলিটারি শাসন জারি করতে চাইছে—কারণ বলশেভিকদের দমনে এই সরকার ব্যর্থ। একদিকে বলশেভিক, অন্যদিকে কর্নিলভের সেনা—সমাজের এরকম দুই চরমপন্থী বিভাজনে ও দ্বন্দ্বে মেনশেভিকরাও শেষপর্যন্ত বেছে নেয় বলশেভিকদের পক্ষ ও আশ্রয়। বলশেভিক সেনার কাছে কর্নিলভের সেনা সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়। সোভিয়েতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা জয় করে বলশেভিকরা। তারা মেনশভিকদের প্রস্তাব দেয় তাদের মন্ত্রীসভা থেকে কেরেনস্কি ও পুঁজিপতিদের বরখাস্ত করে পুরোপুরি নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করুক, বাইরে থেকে বলশেভিকরা সমর্থন জানাবে। কারণ মেনশভিকদের মধ্যে প্রগতিশীল আদর্শ ছিল। কিন্তু তারা তাতে রাজি হয়না। উপরন্তু স্কোবেলভের মতো মেনশভিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের পরেও লেনিনকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

আসে নভেম্বর মাস। দেশে খাদ্যের সংকট ভয়াবহ। তা জোগানের কোনও সম্ভাবনা নেই। এটাই গণ-অভ্যুত্থানের যথাযথ সময়। কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিঙে

অভ্যুত্থানের গৃহীত সিদ্ধান্ত বলশেভিক নেতা জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ মেনশভিকদের পত্রিকা 'নতুন জীবন'-এ ফাঁস করে দেন। আবার অন্যদিকে ট্রটস্কি বলেন এটা অভ্যুত্থানের সঠিক সময় নয়। ক্রুদ্ধ যুবকরা বোমাবাজির মাধ্যমে বিপ্লব আনতে চায়— ট্রটস্কিপন্থীদের এরকম সমালোচনা করে লেনিন নির্দিষ্ট করেছেন লড়াই কখন ব্যক্তিগত সন্ত্রাস না হয়ে অভ্যুত্থানের রূপ নেয়—

> 'প্রথম, অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণী, বাস্তবে, কথায় নয়। অর্থাৎ পার্টি হবে সম্পূর্ণত শ্রমিকের পার্টি। দ্বিতীয়, অভ্যুত্থান ঘটবে এমন সময়ে যখন জনতার আন্দোলনে একটা জোয়ার ডেকেছে। তৃতীয়, যখন জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আমরা পেয়ে গেছি। চতুর্থ, সর্বপ্রকার আপসপন্থী পার্টির যখন নৈতিক পরাজয় ঘটে গেছে। পঞ্চম, শত্রুর সেনা ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যখন আমাদের প্রভাব ছড়িয়েছে। ষষ্ঠ, আমাদের স্লোগানগুলি যখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। সপ্তম, কৃষকদের একটা বৃহৎ অংশের সমর্থন যখন আমরা পেয়ে গেছি। অষ্টম, যখন অর্থনৈতিক অবস্থা এমন তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, জনতার মধ্যে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের মোহটা আর নেই।...কমরেডস, এই আটটি শর্ত পালিত হলে তবে হয় গণ অভ্যুত্থান, ইন্‌সারেকশন নইলে শুধু ব্যর্থ খুনোখুনি।'[১৭]

নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখি লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এবং সেই অভ্যুত্থানে মেনশেভিক সরকার পর্যুদস্ত হয় এবং শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করে।

লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস' অবলম্বনে রচিত এই নাটকের পটভূমি যদিও রাশিয়া, কিন্তু নাটকের ঘটনার সংস্থাপন, চরিত্রের রচনা, সামাজিক সংকট যেন সাতের দশকের ভারতবর্ষের রাজনীতির সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়। নাটকের মধ্যে সরকার কর্তৃক বলশেভিকদের আক্রমণ, তাদের দমন করার প্রবণতা, পার্টি কর্মীদের খুন ইত্যাদি যেন সাতের দশকের বাংলার রাজনীতির এক বাস্তব চিত্র। নাটককার খুব সচেতনভাবেই জরুরি অবস্থার কথা এখানে বারবার ব্যবহার করেছেন। জরুরি অবস্থার সময় যখন আমাদের দেশে গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রবণতা চলছিল, যখন কমিউনিস্ট

শিবিরে মতাদর্শগত বিরোধ দেখা যাচ্ছিল এবং তার ফলে একাধিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল সেই সংকটকে কাটিয়ে ওঠার জন্য নাটককার উৎপল দত্ত একজন লেনিনের মতো নেতার সন্ধান করেছেন। যে জরুরি অবস্থার মতো জটিল সময়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারবে। যে এরকম পরিস্থিতিতে পার্টির কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিতে পারবে।

এবার রাজার পালা:

সরাসরি জরুরি অবস্থাকে অনুষঙ্গ করে উৎপল দত্ত রচনা করেন 'এবার রাজার পালা' (প্রথম অভিনয়: ৬ জানুয়ারি, ১৯৭৭) নাটক। সমালোচক সৌমেন চট্টোপাধ্যায় নাটকটি সম্পর্কে বলেছেন—

> 'সেই অন্ধকার আর আতঙ্কের দিনগুলিতে জীবন যখন একেবারেই সঙ্কুচিত, সীমাহীন ত্রাসের সেই রাজত্বে পূর্বভারতের বুদ্ধিজীবীরাও যখন বিশেষ কিছুই করছেন না, তখন দাসত্ব আর স্বৈরাচারের দিগন্তে স্বাধীনতার তিমিরবিদারী অরুণদয়ের ঊষালগ্ন প্রত্যক্ষ করেছিলেন উৎপল। সেই শেষ আঘাত হানার সময়ে অস্ত্র নির্বাচনে একটুও ভুল হয়নি তাঁর।...হিটলারের অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ব্রেখট্ লিখেছিলেন 'Der Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui'...ইন্দিরা গান্ধীর সমুত্থান রূপকে বিধৃত হল 'এবার রাজার পালা' নাটকে। ফলে ১৯৭৭-এর ভারতবর্ষ হয়ে উঠল ১৯৪৬-এর ডিসএম্বর মাসে উত্তর বাংলার মেচগীর রাজ্যের পীঠস্থান গ্রাম।'[১৮]

উৎপল দত্ত নিজে নাটকটি সম্পর্কে বলেছেন—

> 'এবার রাজার পালা' নামে যে নাটকটা লিখে নামাই, সেটা আমার প্রিয় নাটকগুলোর মধ্যে একটা। ভ্রাম্যমান অভিনেতার একটা দল সহসা জানতে পারে, তাদের মধ্যে যে লোকটি রাজার পার্ট করে সে একজন সত্যিকার রাজা এবং সে যখন তার ন্যায়সঙ্গত সিংহাসন দখল করে, তখন সে তার সহঅভিনেতেদের নানা পদে নিযুক্ত করে, এবং তারা নতুন নাটক অভিনয়

করার উদ্যোগ নেয়। তারা সংবিধান, আইন আর যত সব পৌর স্বাধীনতা সব বাতিল করে, এবং গ্যেটের ভিলহেলেম মাইস্টারের থিয়েটার অ্যালেগরির ধাঁচে তাদের একেবারেই থিয়েটারের সমস্যার ভেতর গণতন্ত্ররিক্ত একটা জাতির ট্রাজেডিকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে চায়। কিন্তু তারা বাস্তব ও প্রতিভাসের তফাত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার সানন্দে তাদের ধ্বংসকেই ডেকে আনে, যেভাবে ভারতের শাসকবর্গ ত্বরান্বিত করে চলেছে তাদের পতন।'[১৯]

উপরোক্ত মতের সাপেক্ষে বিচার করলে নাটকটির প্রকৃত নির্যাস বেরিয়ে আসবে। কাহিনি-চরিত্র-সংলাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জরুরি অবস্থার উত্তাল রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নাটকটির গুরুত্ব বোঝা যাবে।

নাটকটির শুরুতে যে 'প্রস্তাবনা' অংশটি আছে তা থেকে আমাদের কাছে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়—

১. নাটকটির পটভূমি হিসেবে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

২. উত্তরবঙ্গের মেচগীর স্টেটে যে ননী অধিকারীর দল 'কংসবধ' নামক একটি নাটক করার ডাক পেয়েছে সেই স্টেটের কুমার বাহাদুর ত্রিদিব সিংহ মারফত, সেই দলের প্রধান ননী অধিকারী রচিত 'নীলকুঠি' পালা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

৩. তার দলে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে স্থান পায়—যেমন ঝগরু নাপিত, চন্দ্রশেখর ডোম।

৪. দলের অন্যতম অভিনেতা বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কু সর্বদাই রাজার পাট করে—যেমন রাবন, দুর্যোধন, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, সিরাজদ্দৌলা। এমনকি সে এও বিশ্বাস করে যে, তার দেহে রাজরক্ত আছে। রাজার পাট করতে করতে তার 'ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে বাস্তব, সত্যি হয়ে উঠেছে সেই লাল-কাপড়-মোড়া ভ্যানেস্তার চেয়ারের সিংহাসন, সেই মর্চে ধরা তলোয়ার আর চুমকি-আঁটা সোলার মুকুট।'[২০]

'প্রস্তাবনা'-র পরে মূল নাটকের প্রথম দৃশ্যে ননী অধিকারীর দল 'কংসবধ' পালার মহড়া দিচ্ছে, সেখানে কংস চরিত্রে অভিনেতা বঙ্কু যে সংলাপ বলে তা জরুরি অবস্থা জারির পিছনে থাকা শাসকের মানসবিম্বই তুলে ধরে—

> '...চাহিনা শুনিতে প্রতিবাদ মতামত। আমার রাজ্যে আজি ক্ষীণতম স্বরে কেহ যদি করে মোর শাসনের নিন্দাবাদ, অন্ধকূপ কারাগারে নিক্ষেপিয়া তারে রাখিও শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি।'[২১]

জরুরি অবস্থার ঘোষণা স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের পরিচয় বহন করে। আর সেই স্বরূপ নিজস্ব ভঙ্গিতে 'এবার রাজার পালা' নাটকে প্রথম থেকেই উদঘাটন করেছেন নাটককার। কাহিনির গতি যত এগিয়েছে সেই স্বরূপ ততোধিক স্পষ্ট হয়েছে।

নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়, মেচগীর স্টেটের স্বাধীন রাজা টিকেন্দ্রজিত হটাৎ মারা যাওয়ায় বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কু স্টেটের পরবর্তী রাজা হয়। কারণ মহারাজের আটত্রিশজন জারজ সন্তানের মধ্যে সে বয়োজ্যেষ্ঠ। তাকে রাজা করার পিছনে দেওয়ান স্যার হরকিশোর রায়, মন্ত্রী দোলগোবিন্দ মুখুয্যে এবং ব্রিগেডিয়ার বর্মনের কুটিল রাজনীতি কাজ করেছে। তারা ভেবেছিল রাজার ভাই ত্রিদিব সিংহের জায়গায় রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বঙ্কু রাজা হলে তারা তাকে নিজেদের মতো পরিচালনা করতে পারবে। কিন্তু নাটকের অগ্রগতিতে তাদের সেই আশা দুরাশায় পরিণত হয়। এই বঙ্কু যাত্রাদলে বিভিন্ন রাজার চরিত্রে অভিনয় করতে করতে সে নিজেকেও তাঁদের মতোই রাজা ভাবতে থাকে। সে বলে, 'চলো ননীদা এবার রাজার পালা, সত্যিকারের রাজার পালায় গান গেয়ে আসি'[২২]। তাই যখন সে বাস্তবে রাজা হয় তখন সেও যাত্রার রাজাদের মতো কথা বলে, কখনও সিরাজউদ্দৌলা, তো কখনও কংস। আবার যাত্রার রাজাদের মতো খামখেয়ালিভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকে। সিংহাসনে বসেই বঙ্কু প্রথম থেকেই রাজ্যের পুরনো প্রথা ভাঙতে থাকে—যেমন পোলো খেলা নিষিদ্ধ করে দেয়, রাজপরিবারে চলে আসা দীর্ঘদিনের বিবাহ রীতি নস্যাৎ করে দেয়। বঙ্কুর অবৈধ পিতা টিকেন্দ্রজিৎ পূর্বেই তার বিবাহের জন্য পাত্রী নির্দিষ্ট করে রাখলেও সে তাকে বিয়ে করে না। বদলে তাদের দলের যমুনাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করে। এই যমুনা আসলে ছিল একজন পতিতা নারী, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করেছিল বঙ্কুই। কিন্তু ত্রিদিব সিংহ টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে নিয়ে যায়।

পরে বঙ্কু রাজা হয়ে নারীহরণের অপরাধে ত্রিদিব সিংহকে গ্রেপ্তার করায়। যদিও এর পিছনে বঙ্কুর রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করেছিল। যেহেতু মহারাজার ভাই হওয়ার সূত্রে ত্রিদিব সিংহ সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার ছিল। সেজন্যই বঙ্কুর এই পদক্ষেপ।

বঙ্কুর রাজ্যাভিষেকের দিন বানিয়া কিশোরীলাল চামরিয়া নতুন রাজাকে সেলাম জানাতে আসে। কিশোরীলাল চামরিয়া ব্যাঙ্ক মালিক। মেচগীর স্টেটের জঙ্গলগুলি ইজারা নিয়ে সে কাঠের ব্যবসা করতে চায়, ইসলামপুর মহল্লাটা ইজারা নিয়ে সেখানে মাটি খুঁড়ে লোহার খনি তৈরি করতে চায়। পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিনিধি সে। তার অভিসন্ধিতে বারবার বাধা দিয়েছে রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ। কারণ তারা ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি এবং বানিয়াদের বাড়তে দিতে চায়না। কিন্তু বঙ্কু তাকে প্রাধান্য দেয়, যেহেতু তার কাছে আছে রাজকোষাগারের থেকেও বেশি অর্থ। বঙ্কুর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে হরকিশোর সহ বাকিরা। রাজ্যের জমিদাররা এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে হরকিশোর ভয় দেখালে বঙ্কু আইন করে চিরতরে জমিদারি প্রথার অবলুপ্তি ঘটানোর পথে হাঁটে। কিন্তু প্রজা-পরিষদে বিল পাশ না করলে আইন বলবৎ হবে না বলে হরকিশোর জানালে বঙ্কু সদর্পে বলে—

> ‘সারা রাজ্য ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে জনতাকে জাগাব—সেই জনতা এসে প্রজা-পরিষদকে বাপ বাপ বলে ভোট দেওয়াবে।...বঙ্গেশ্বর সিংহ এ-দেশকে জাগাবে।–জমিদারি নিপাত যাক। জাতির অভ্যুত্থান।’[২৩]

হরকিশোরই ছিল প্রজা-পরিষদের অধ্যক্ষ, যাকে মহারাজা নিয়োগ করে। ফলে নিজের বলপ্রয়োগ করে তার জায়গায় চন্দ্রশেখর ডোমকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করে প্রজা-পরিষদকে পথে আনার জন্য। এরপর বঙ্কুকে দেখা যায় জনসভার মঞ্চে বক্তৃতা দিতে। একদিকে জনসভায় সে বলে—

> ‘আমি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, কারণ আমি এক সমাজতান্ত্রিক রাজা।...এ-দেশ জমিদারের নয়, পুঁজিপতিদের নয়, এ দেশ আপনাদের’।[২৪]

আবার অন্যদিকে কাজের ক্ষেত্রে দেখি রাজ্যের জাতীয় সম্পদ কিশোরীলাল চামারিয়ার মতো পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়। তার বক্তৃতার সঙ্গে এবং বাহাত্তর দফা কর্মসূচি

ঘোষণার মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনীতির ছাপ পাওয়া যায়—'গরিবি হটাও' শ্লোগানের সঙ্গে বঙ্কুর বক্তব্য 'এদেশ থেকে দারিদ্র্য আমি দূর করব'[২৫]-এর মিল পাওয়া যায়। এছাড়াও বাহাত্তর দফা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতিরোধ, গণ-নিবীর্যকরণ ইত্যাদির কথা।

এমতাবস্থায় 'উত্তরবঙ্গ পত্রিকা'-তে বঙ্কুর বিরুদ্ধে সংবাদ বার হয় 'বেশ্যার জন্য ত্রিদিব সিংহ গ্রেপ্তার! নূতন রাজার লাম্পট্য কাহিনী'[২৬] শিরোনামে—যা বঙ্কুকে রুষ্ট করে, আবার বিগত দশ দিনে যে চোদ্দটা বক্তৃতা দিয়েছে সেগুলোকে পত্রিকার পঞ্চম পাতায় মাত্র ছয় লাইনে বেড়িয়েছে। সেই পত্রিকার মালিক জমিদার নন্দন কুমার ইন্দ্রজিৎ সিংহ। ফলে এসবের পিছনে রাজা বঙ্কুর বিরুদ্ধে জমিদারদের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে—এই ভেবে সংবাদপত্রর উপর সেনসর চাপায়। তাকে আগে না জানিয়ে এমন কোনও খবর এরপর থেকে বার হবে না—এরকম আদেশ জারি করে। অন্যদিকে কিশোরীলাল চামারিয়া দু'লক্ষ টাকা দিয়ে রাজ্যের ফৌজ ও পুলিশকে হাতের মুঠোয় করে নেয়। ফলে যে বর্মন একসময় বঙ্কুর দিকে বন্দুক তোলে সেই বলে 'স্যার আই ইজ ইওর হাম্বল সার্ভেন্ট'[২৭]। বঙ্কু পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বোনাস বন্ধের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল প্রজা-পরিষদের কাছে, কিন্তু তা নাকচ করে দেয়—সেখানে ৪০টি ভোট প্রস্তাবের পক্ষে পড়েছিল, আর বাকি ১০৩টি ছিল বিপক্ষে। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের উপর নির্ভর করে বঙ্কুর আর্জি খারিজ হয়ে যাওয়ায় রুষ্ট হয়ে সে যা বলে এবং বর্মনকে যা আদেশ করে তা জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

> '...গণতন্ত্র মানে আমি যা বলব সবাই মিলে তাই করবে। সেটাই গণতন্ত্র। বর্মন পুলিশ নিয়ে যাও, ইউ গোজ উইথ পুলিশ। যে ১০৩ জন বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার ক'রে জেলে পুরে দাও। বাকি থাকবে যে ৪০ জন তারা সবাই প্রস্তাবের পক্ষে। তাদের সামনে প্রস্তাবটা আবার পেশ কর চন্দ্রশেখর ডোম, সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হবে। এটাই হোল প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। বর্মণ!
>
> ...

অপরাধটা বুঝলেন পরে ভেবেচিনতে তৈরী করা যাবে—খুন, রাহাজানি, নারীহরণ-লাগসই কিছু একটা বসে ঠিক করা যাবে'খন—। আপাতত গণতন্ত্রকে রক্ষা ক'রে নিই। বর্মন।'[২৮]

কিন্তু এর প্রতিবাদে হরকিশোর সংবিধানের দোহাই দিয়ে মৌলিক অধিকারের কথা স্মরণ করায়। নাগরিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে। তখন সংবিধান সংশোধনের কথা ওঠে। কিন্তু রাজ্যে সংকট অবস্থা (জরুরি অবস্থা) জারি না হলে তা বেআইনি। সেজন্য রাজ্যে কৃত্রিমভাবে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করে সংকট অবস্থা জারি করার পরিকল্পনা আঁটে। অপরদিকে আবার বোনাস বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে ভীষ্মলোচন দাস ও শেখ ওসমানের নেতৃত্বে শ্রমিক ইউনিয়ন ধর্মঘট ডাকে। তাদের প্রতিবাদ দমনের জন্য ঝগরু নাপিতের পরামর্শে গুন্ডাবাহিনীর প্রতিনিধি ট্যাংরাকে পাঠানো হয়। সেই সঙ্গে বর্মনকে আদেশ দেওয়া হয়, সংকট অবস্থা জারি হওয়ার পর যেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে ভীষ্মের কুটিরে ঝগরু নাপিত এসে ভীষ্ম ও ওসমানকে বঙ্কুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ভর্ৎসনা করে। কারণ সে মনে করে বঙ্কু তাদের স্বার্থের জন্যই নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু তার ভুল ভাঙতে দেরি হয় না—সে চিনতে পারে নীতির মুখোশধারী রাষ্ট্রের কালো রূপকে। যেমন, রাষ্ট্রে খাতাই-কলমে জমিদারি প্রথা তো বিলোপ হয়ে গেছে, কিন্তু বাস্তবে জোতদাররা বেনামে জমি দখল করে রেখেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে, কিন্তু ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষনা করা হয়েছে। সেই সুযোগে কিশোরীলাল চামারিয়া ছাঁটাই করে চলেছে তার কারখানায়। এমতাবস্থায় ননী ও ট্যাংরা এসে হাজির হওয়ার উপক্রম হলে ঝগরু সেখান থেকে আড়ালে চলে যায়। ভীষ্ম যেমন আর বিশ্বাস করে না বঙ্কুকে, ননীও সেরকম। ননীও বোঝে ভীষ্ম ও ওসমানকে গ্রেপ্তার করে তাদের আন্দোলনকে দমন করলে তা গণতন্ত্রের অবমাননা ছাড়া আর কিছুই হবে না। সেজন্য ননী ইঙ্গিতে তাদের বুঝিয়ে দেয়, বঙ্কুর আমন্ত্রণে যদি তারা আলোচনা সভায় যোগ দেয় তাহলের তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কারাগার। সুতরাং তাদের অন্তর্ধান হওয়াই শ্রেয়। তাদেরও সেই ইঙ্গিত বুঝতে ভুল হয় না। তাই তারা শেষপর্যন্ত চক্রধামপুরের জঙ্গলে আত্মগোপন করে তাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যায়, রাজ্যে সংকট অবস্থা জারি হয়েছে, খবরের কাগজে চেপেছে সেনসর, বঙ্কু নিজের চুল আর গোঁফ রেখেছে হিটলারি কায়দায়। হিটলারের কায়দায় সে রাজ্য পরিচালনা করার সংকল্প নেয়। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থা। যে ১০৩ জন প্রজাপরিষদের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, আদালতের বিচারে তারা একে একে মুক্ত হচ্ছে। তখন রাজ্যের বিচার পদ্ধতিকে হাতের মুঠোয় আনতে পুনরায় বঙ্কু এমন আইন প্রণয়ন করে যার বলে আদালত তো থাকবে, কিন্তু তার ক্ষমতা থাকবে না। আবার এসময় খবর পায়, চক্রধামপুরে পুলিশের অস্ত্রাগার লুঠ করে ভীষ্মরা প্রায় দুশো লোক নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের বুঝতে বাকি থাকে না এই সুযোগে ব্রিটিশ সরকার রাজ্যে অরাজকতার অজুহাত দেখিয়ে সৈন্য ঢুকাতেও পিছুপা হবে না। কারণ ব্রিটিশ সরকার প্রথম থেকেই প্রাদেশিক রাজ্যের অবসান ঘটাতে চায়। এই বিদ্রোহের কারণ কী তা বঙ্কু বুঝতে পারে না। সে মনে করে তাদের মুক্তির জন্যই সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তখন চন্দ্রশেখর ক্ষোভের সঙ্গে বলে—

> ‘বোনাস বন্ধ ক’রে ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিয়ে তারপর মজুরদের মুক্তির কথা কইলে সেটা হাস্যকর শোনায়।...চাষীমজুরের সর্বনাশ করে প্রগতির কথা আমি শৈব না।...এদ্দিন রাজা বলেছিল সে জমিদারদের শেষ করবে।...এখন এ মজুরদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে—ভীষ্মকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল’।[২৯]

কিন্তু বঙ্কু সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বর্মনকে আদেশ দেয় ভীষ্মদের বিদ্রোহ দমন করতে। জঙ্গল শ্রমিক ইউনিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কমিটির সদস্যদের দেখা মাত্র গ্রেপ্তারের ফরমান জারি করে। তবে ননী গণ-আন্দোলন দমন করার প্রবণতাকে একদম পছন্দ করে না। সে বার বার তাই ভীষ্মদের নিভৃতে রক্ষা করার চেষ্টা চালায়। এবারও সে আন্দোলন দমন করার ক্ষেত্রে বঙ্কুর পরিকল্পনার কথা একটি চিঠিতে ব্যক্ত করে যমুনার মারফত ভীষ্মদের কাছে পৌঁছে দেয়। আবার অপরদিকে বঙ্কুও ক্রমশ বিশ্বাস হারাতে থাকে তার নিজের আপনজনের উপর থেকে। তাতে ননীও বাদ পড়ে না। ননীর লেখা বক্তৃতায় সে আর ভরসা পায় না। নিজের বক্তৃতা নিজেই তৈরি করতে শুরু করে। তার

বক্তৃতার মধ্যে এরপর ফ্যাসিবাদীরূপ ধরা পড়ে। রাজ্যে নতুন সেন্ট্রাল জেল উদ্বোধন করতে গিয়ে বঙ্কু যে বক্তৃতা দেয় তাতে জরুরি অবস্থার নগ্নরূপ ধরা পড়ে—

> 'বন্ধুগণ, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে গোপিকাপুর সেন্ট্রাল জেলের উদ্বোধন করলাম। এই নূতন কারাগারে ১৮,০০০ বন্দী সুখে বাস করতে পারবে। এ জেল মেচগীর রাজ্যের বিস্ময়কর অগ্রগতির সাম্প-সাম্প-সাম্প্রতিকতম নিদর্শন। এ-দেশের প্রতীক হওয়া উচিত জেল। জেল হচ্ছে সেই মন্দির যেখানে এ-দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বাস্তব রূপ পেয়েছে। আমরা জরুরি অবস্থা জারি ক'রে বলেছিলাম, পুরো রাজ্যকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। জেল হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে এই শৃঙ্খলা সুচারুরূপে পালিত হয়। সহস্র সহস্র সুখী সমৃদ্ধ কয়েদি এক সঙ্গে স্নান করে, এক সঙ্গে খায় তারপর এক সঙ্গে হাসিমুখে উদয়াস্ত খাটে, বোনাস চায় না, মাইনেই চায় না তায় বোনাস এবং প্রহরীর লাঠিকে শ্রদ্ধাসহ অবনতমস্তকে মেনে নেয়। উপরন্তু কয়েদিদের যৌনজীবন নেই, সুতরাং তারা সন্তানের জন্ম দিতে পারে না, সুতরাং বলা যায় পরিবার-পরিকল্পনা একমাত্র জেলখানাতেই সম্পূর্ণভাবে সফল ও সার্থক। বন্ধুগণ, কয়েদিরা আদর্শ নাগরিক। ওদের কাছে নিয়মানুবর্তিতা শিখুন, ওদের মতন হয়ে উঠুন। কয়েদিরা কখনো স্ট্রাইক করে না। এ পুরো রাজ্যটাকে জেলখানার অনুকরণে ঢেলে সাজান। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, সবই যেন একদিন জেলে আসতে পারেন। তাহলে আমরা একদিন গর্ব করে বলতে পারব, পুরো দেশটা একটা জেলখানার মতন সুশৃঙ্খল, কর্মঠ ও প্রতিবাদহীন। আমি ভেবে দেখছি যে সমাজতন্ত্র আমি চাই তা শুধু জেলখানাতেই সম্ভব। আসুন এ দেশটাকে কারাগার বানাবার সাধনায় ব্রতী হই।'[৩০]

এরপর নাটকের পটপরিবর্তনের পর পুনরায় প্রাসাদের দৃশ্যে আসে। এখানে জরুরি অবস্থার সেনসরের একটি রূপ তুলে ধরা হয়েছে। ননী অধিকারী 'উত্তরবঙ্গ পত্রিকা' পড়ে। কিন্তু সেনসরের কারণে শিরোনাম ছাড়া পত্রিকায় আর কিছুই ছাপা নেই। পূর্বের আলোচনায় দেখিয়েছি সেনসরের প্রতিবাদে 'স্টেটসম্যান' জরুরি অবস্থার সময় একবার সংবাদহীন সাদা কাগজ বার করেছিল। এদিকে বিদ্রোহী শ্রমিকদের লাগাতার

গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কিন্তু তাদের ধর্মঘট ভাঙা যাচ্ছে না। ব্রিটিশ রেসিডেন্সি সতর্ক করেছে, যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করা না যায় তাহলে ব্রিটিশ সৈন্য প্রবেশ করবে। আবার অন্যদিকে নেহেরু মেচগীর রাজ্যের প্রজাদের অসহযোগ আন্দোলনের উৎসাহ দিচ্ছে বারবার। কিন্তু কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে জনগণের মধ্যে রোষ সৃষ্টি হয়। সেজন্য জনগণকে বঙ্কুমুখী করতে হবে, বঙ্কুকে একটি মহান চরিত্রে জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বলে ননী মত প্রকাশ করেছে। এর জন্য পত্রিকাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। ননী জানিয়েছে পত্রিকা জুড়ে থাকবে বঙ্কুর বক্তৃতা, তার সর্বক্ষণের ছবি। তার সঙ্গে থাকবে তার জীবনী। কিন্তু সেটাও হবে বানানো একটি মহান জীবন চরিত— উপন্যাসের মতো।

এরকম পরিস্থিতিতে বর্মন এসে জানায়, তারা জঙ্গলে শ্রমিকদের সঙ্গে প্রাথমিক যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছে। তাদের পরিকল্পনার খবর পূর্বেই শ্রীনিবাস ময়রার মাধ্যমে চিঠি মারফত ভীষ্মদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ভীষ্মদের পরাস্ত করতে বঙ্কু শেষপর্যন্ত ভীষ্মের স্ত্রী আন্নাকালীকে গ্রেপ্তার করে তার উপর শারীরিক অত্যাচার করার আদেশ দেয়। তার সঙ্গে আরও আদেশ দেয়—

> ‘ননীবাবু, আজ থেকে কার্ফু জারি হল সারা মেচগীর রাজ্যে, বিকেল পাঁচটা থেকে সকাল ছ’টা। লিখে আনুন। হরবাবু, আজ চারটের সময় কমিউনিস্ট পার্টি মিটিং ডেকেছে টাউন-হলের মাঠে। সে মিটিং গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করা হবে। অন্তত দশটা মৃতদেহ যেন পড়ে থাকে মাঠে এখানে-ওখানে।...আমি দরকার হলে ব্রিটিশ সৈন ডাকব।’[৩১]

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সৈন্য দেশীয় পুঁজিপতিদের পরিপন্থী। সেজন্য ব্রিটিশ সৈন্যর সাহায্য নেওয়ার কথাতে চামারিয়া আপত্তি জানায়। রাজ্যের প্রজারা কঠোরভাবে রাজার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে কেন তাও বুঝতে বঙ্কুর বাকি থাকে না। পুঁজিপতিদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। চামারিয়ার কথাতেই বঙ্কু তাদের বোনাস বন্ধ করেছে। ফলে চামারিয়ার সঙ্গেও বঙ্কুর বিরোধ বাধে। এরপর বঙ্কু ঝগরু নাপিতকে সন্দেহ করে। সে মনে করে এই ঝগরু ভীষ্মদের সঙ্গে মিলিত। কারণ সংকট অবস্থার সময় ঝগরু ভীষ্মর কুটিরে গিয়েছিল এবং সেখানে তার ক্ষুরটা

ফেলে এসেছিল। যেটি ট্যাংরা মস্তান বঙ্কুর হাতে তুলে দেয়। সন্দেহ শুরু হয় সেখান থেকেই। সেজন্য বঙ্কু মনে করে ঝগরুই তাদের পরিকল্পনার কথা পৌঁছে দেয় ভীষ্মদের কাছে। সেজন্য বঙ্কু তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। এই সময় ঝগরুর সংলাপে উঠে আসে স্বৈরাচারী শাসকের রাজ্যের অবস্থা—

> '...এখানকার বাতাসে বোধহয় কেমন অবিশ্বাস আর ভয় মিশে আছে।...তুমি দেশটাকে এমন এক জেলখানা ক'রে তুলেছ যে এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস ক'রে মনের কথা কইতে পারছে না।'[৩২]

আবার অন্যদিকে বঙ্কুর আদেশ মতো ট্যাংরা ও বর্মন ভীষ্মর স্ত্রী আন্নাকালীকে সিংহগর থানায় ধরে এনে অকথ্য অত্যাচার চালায়। যার পরিণতিতে শেষপর্যন্ত সে মারা যায়। স্বৈরাচারী শাসকের সবসময় দুটি প্রধান অস্ত্র হল পুলিশ ও গুন্ডা। সেজন্যই যে ট্যাংরা একদিন ত্রিদিব সিংহর আদেশে বঙ্কুকে চাবুক মেরেছিল সেই ট্যাংরাই পরবর্তীতে বঙ্কুর অন্যতম খাস লোকে পরিণত হয়। এই সত্য ট্যাংরার মুখেই শোনা যায়—'আমরা মানে এই ট্যাংরা আর বর্মনরা—বঙ্কুদের কাছে বড় দরকারি। ট্যাংরা আর বর্মনদের কখনো বিপদ হয় না।'[৩৩]

ঘটনার পর ঘটনায়, সংঘাতের পর সংঘাতে নাটকের গতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সকলে উপস্থিত হয়েছে গোপিকাপুর রেডিও স্টেশনের উদ্বোধনে। যে রেডিও স্টেশনের মুখ্য উদ্দেশ্যই সরকারের গুণগান গাওয়া। স্বৈরশাসনে সন্দেহর আবহাওয়া সর্বত্র। সেজন্য রেডিও স্টেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রবেশের পূর্বে নিজের ঘনিষ্ঠ পার্ষদদেরও দেহ খানাতল্লাশি করা হচ্ছে এবং তার দায়িত্বে আছে গুন্ডা ট্যাংরা। শাসক নিজের সিংহাসন রক্ষার্থে হত্যালীলায় মেতে উঠেছে। সামান্যতম সন্দেহ বশত নিজের কাছের মানুষকেও বাদ রাখেনা। হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে বাঁচতে তাই বঙ্কুর বিরুদ্ধেও সকলে যেতে থাকে। ভীষ্মদের মতো শ্রমিক নেতা ও তাদের শ্রমিক সংগঠন তো আগে থেকেই বঙ্কুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদরত। তার যাত্রাদলের পুরনো সঙ্গী, স্ত্রী যমুনা, পার্ষদবর্গ—প্রত্যেকের মনেই তার প্রতি ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। কারণ সে রাজ্যের গণতন্ত্র বিনাশ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। প্রত্যেকেই চায় তার অবসান। ফলে সামান্য সুযোগেও বিরোধিতা করতে কেও ছাড়ে না। ট্যাংরার মতো সমাজবিরোধীদের দমন প্রত্যেকটি সচেতন নাগরিকেরই কাম্য। সেজন্য

কৌশলে যমুনা তাকে ফাঁসিয়েছে। আবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করতে গিয়ে বঙ্কুরই সহকর্মী চন্দ্রশেখর ডোম দাশরথী রায়ের গান গেয়ে বঙ্কুর স্বৈরশাসনের বিরোধিতা করেছে—

'যেমন পাপ ঘুচিলে পৃথিবী পবিত্র বলি শাস্ত্রমত।

দুর্জন ঘুচিলে গ্রাম পবিত্র, দস্যু ঘুচিলে পথ।।

রাহু ঘুচিলে চাঁদ পবিত্র, আলো করে ভুবন।

জঙ্গল ঘুচিলে স্থান পবিত্র, বেণী ঘুচিলে কেশ।

অত্যাচারী রাজ ঘুচিলে পবিত্র স্বদেশ।।'[৩৪]

এই গানে ভীত হয়ে বঙ্কুর মতো শাসক তাকে হত্যা করিয়ে প্রতিবাদ স্তব্ধ করিয়েছে।

নাটকের ঘটনা ক্রমশ পরিণতির দিকে এগাই। বঙ্কুর সঙ্গে যারা ছিল তারা একে একে তার বিরুদ্ধে চলে যেতে থাকে এবং প্রতিবাদ করায় তারা সকলেই শাস্তি ভোগ করে। বঙ্কুর ফ্যাসিবাদী রাজনীতি তাকে ক্রমশ একা করে দেয়। নিজের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ব্রিটিশ সেনা ডাকে। অন্যদিকে ননী অধিকারীর সমর্থন থাকে ভীষ্মদের আন্দোলনের ওপর। সেই আন্দোলন রক্ষার তাগিদে নিজে বঙ্কুর মতো হিটলারী সাজ সেজে ব্রিটিশ সৈন্যকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। ফলে রাজ্যে ব্রিটিশ সৈন্য আসতে বিলম্ব ঘটেছে এবং ভীষ্মরা নিজেদের বিদ্রোহ রক্ষা করার সময় পেয়েছে। কিন্তু বঙ্কুর প্রতি ননীর এই বিরুদ্ধাচারণ বঙ্কুর কাছে অজানা থাকেনি। সে জেনে গেছে ননী আসলে ভীষ্মকে সমর্থন করে। ওসমানের সঙ্গে সে গোপনে বৈপ্লবিক আলোচনা করেছে। ফলে ননীকে দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করার আদেশ দিয়েছে বঙ্কু।

শেষ পর্যন্ত বঙ্কু ও ননী সামনাসামনি হয়। বঙ্কু তখন নেশাগ্রস্ত। সে অবস্থাতেই আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। ননী আয়নার কাচ খুলে তার প্রতিবিম্বের মতো আচরণ করে। দুজনের সাজ হিটলারের মতো। এখানে দুজনের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা যেন জরুরি অবস্থার স্বৈরশাসনেরই অন্তর্নিহিত অর্থ—

'ননী : আমি তোমার ছায়া নই। তুমি আমার ছায়া। আমি আসল আডল্‌ফ্‌ হিটলার। তুমি আমার প্রতিবিম্ব। আমার সুনিপুণ অনুকরণ।

বঙ্কু : আপনি তো বেশ, বাংলা বলেন।

ননী : হ্যাঁ, তবে একটা ব্যাপারে তুমি আমাকে হারিয়েছ—তাই তোমাকে সাধুবাদ দিচ্ছি।

বন্ধু : কি সেটা গুরুদেব ?

ননী : আমি জার্মানিতে স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন ক'রে সেটাকে স্বৈরাচারই বলেছিলাম, ডিক্‌টেটরশিপ বলেছিলাম। তুমি সেটাই তোমার দেশে চালু ক'রে বলছ গণতন্ত্র। এটা খুব জোর এক হাত নিয়েছ ভায়া। সবাই ডাণ্ডা খাবে ঘাড়ে-মাথায়, অথচ তাদের সমস্বরে চেঁচাতে হবে গণতন্ত্রে বাস করছি, এটা আমার মাথাতেও আসে নি।'[৩৫]

বঙ্কু মুখে যতই সমাজতন্ত্রের কথাই বলুক না কেন, আসলে মেচগীর স্টেট ছিল বুর্জোয়াতন্ত্র। কিশোরীলাল চামারিয়ার মতো ব্যাবসায়ীদের হাতেই ছিল সবকিছুর আসল ক্ষমতা। তাই নাটকে ননী শেষপর্যন্ত বঙ্কুকে অমোঘ সত্যটি শুনিয়ে যায়। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' (Communist Manifesto)-এ কার্ল মার্কস ও ফেড্রিক এঙ্গেলস বলেছেন—

'...the bourgeoisie has at last, since the establishment of Modern Industry and the world-market, conquered for itself, in the modern representative State, exclusive political sway. The executive of the modern State is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie.'[৩৬]

ননীও এখানে বঙ্কুকে বলেছে—

'যদি লোকে না মারে, তাহলে যারা আমাদের পোষে তারাই মারবে। আমরা ভাবি আমরাই বুঝি আসল ভাগ্যবিধাতা। আসলে আমরাও পুতুল। আমার

সুতো ছিল ক্রুপ, টিসেন, ফার্বেন প্রভৃতি মহাধনীদের হাতে। তোমার সুতোও বাঁধা রয়েছে বানিয়া জমিদারদের হাতে।'[৩৭]

সে জন্যয়ই নাটকের শেষ হয়েছে চামারিয়ার চক্রান্ত দিয়ে। বঙ্কুই শেষপর্যন্ত ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ত্রিদিব সিংহ রাজা হয়েছে এবং বঙ্কু হত্যার দায় চেপেছে ভীষ্মদের মতো কমিউনিস্টদের ওপর।

'এবার রাজার পালা' অভিনীত হয়েছে জরুরি অবস্থার একদম অন্তিম পর্যায়ে এসে। নাটককার দেখেছেন সমগ্র জরুরি অবস্থার স্বৈরাচারী রূপকে, রাজনীতির অপলাপকে। শাসকের স্বৈরাচারী রূপকে তাই এখানে বাস্তবসম্মত করে তুলতে পেরেছেন। নিজের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা দিতে তৎকালীন শাসক যা করেছে বঙ্কুর মধ্যে তাই তিনি তুলে ধরেছেন। যেমন—বারবার আইন পরিবর্তন, সেনসরশীপ, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, গণতন্ত্র হরণ ইত্যাদি। রাজ্যজুড়ে যেন একটা সন্দেহ ও আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। সেই পরিবেশে শাসক হয়ে ওঠে একা। তাই নাটকে শেষপর্যন্ত বঙ্কুকে দেখি একা। তার পুরানো সঙ্গীরাও হয় নিজে তার থেকে দূরে সরে গেছে, অথবা সন্দেহবশত বঙ্কুই তাদের সরিয়েছে। স্বৈরাচারী শাসকের আসল প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে এই বঙ্কু।

সাদা পোশাক :

জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত 'সাদা পোশাক' (প্রথম অভিনয়—২১ সেপ্টম্বর ১৯৭৭, বাসুদেব মঞ্চ) নামে আর একটি নাটক রচনা করেছেন। সাতের দশকের রাজনৈতিক জটিলতা, কংগ্রেস সরকার ও তাদের পোষ্য গুন্ডাবাহিনী এবং পুলিশের একটা বড় অংশ জোট বেঁধে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক অভিযান চালিয়ে সি. পি. আই. (এম) ও নকশালপন্থী কর্মীদের দমনের চেষ্টা করেছিল সেই বিষয়ই এ নাটকের উপজীব্য। বিভিন্ন দৃশ্যে এবং বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে তা বারবার উঠে এসেছে। ছাত্র-যুব সংগঠনের সদস্য শিলাদিত্য সি. পি. আই. (এম) পার্টির কর্মী জয়দেবকে হুমকি স্বরূপ বলেছে—

'...আপনার পার্টির সদস্যদের যেভাবে সর্বত্র ধোলাই দিয়ে পাড়াছাড়া করা হচ্ছে, একটু সাবধানে থাকবেন। গুলি খেয়ে মরবেন না যেন!'[৩৮]

আবার দ্বিতীয় দৃশ্যে ইনস্পেকটর মহাদেব চাটুজ্যের মুখে শুনতে পায়—

> ‘ওইসব ড্রাগ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে অত্যন্ত ভেবে স্যার। বাংলার কমিউনিস্টদের খুন করা যেমন একদিক, তেমনি আর এক দিক হচ্ছে শনিপূজো, ওলাইপূজো, শ্মশানকালীর পূজো, জয় সন্তোষী মা প্রভৃতির প্রসার। তেমনি তৃতীয় দিক হচ্ছে ড্রাগ, একই প্লানের তিন দিক। উদ্দেশ একই—বাংলাকে শুইয়ে দাও, যেন টুঁ শব্দ না করতে পারে।’[৩৯]

সমগ্র নাটকের পটভূমি হিসেবে জরুরি অবস্থাকে নাটককার নির্বাচন করেননি। আসলে পরিস্থিতির জটিলতা ছিল অনেক আগে থেকেই। তাই নাটকটিকে শুরু করেছেন জরুরি অবস্থা ঘোষণার কিছু আগে থেকে। সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গে বাম, অতিবাম রাজনীতির প্রাধান্য প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে যেমন বিপাকে ফেলেছিল, তেমনি শাসক কংগ্রেসের অস্তিত্বেও সংকট তৈরি করেছিল। ফলে তাদের কর্মপন্থা ও বিস্তারকে দমন করা ছিল দুপক্ষের কাছেই একান্ত জরুরি। তাই সাতের দশকের একটা বড় অংশ জুড়ে চলে সেই দমনের রাজনীতি। ১৯৭২-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার গঠনের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বাড়তে থাকে বিরোধী রাজনীতিকে দমিত করার প্রক্রিয়া। যা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে জরুরি অবস্থার সময়। তেরোটি দৃশ্যে বিভক্ত ‘সাদা পোশাক’ নাটকের কাহিনিতে জরুরি অবস্থার ঘোষণা হয়েছে দশম দৃশ্যে এসে। আগের নটি দৃশ্যে জরুরি অবস্থার পূর্বের দমন-পীড়ন বর্ণিত হয়েছে। নাটকে দেখা যায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর কংগ্রেসি গুন্ডা ও পুলিশের অত্যাচার কীভাবে লাগামছাড়া হয়ে গেল। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, নাটককার সমগ্র পুলিশ কাঠামোকে দোষী করেননি। তিনি নাটকে জনগণের স্বার্থে লড়াই করা কৌশিক বসু, জীবানন্দ হালদার, গিয়াসউদ্দিন মন্ডলের মত সৎ পুলিশ চরিত্রও এঁকেছেন। নাটককার পুলিশের বর্বর আচরণের পিছনে প্রকৃতপক্ষে ‘সিস্টেম’-কে দায়ী করেছেন। সেজন্য পুলিশ কমিসনার সুদিন চক্রবর্তীর মুখেও শুনতে পায়—

> ‘আমি আগে এমন শুয়োরের বাচ্চা ছিলাম না। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেই ব্রহ্মমুহূর্তে, যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটর হয়ে পুলিশে ঢুকলাম—তখন আমি ছিলাম নিষ্কলুষ চরিত্র আদর্শবাদী। তারপর ত্রিশ বছর

> নিরবচ্ছিন্ন শাসনে, আপনাদের হুকুমবরদারি করে করে আমি ডিম ফটে বেল্লিক হয়েছি, অমানুষ হয়েছি। ত্রিশ বছর ধরে দেশের সেরা ছেলেগুলোকে ক্রমান্বয়ে লাঠিপেটা গুলিবিদ্ধ করলে কেউ আর মানুষ থাকতে পারে? সব আপনাদের জন্য, খদ্দরধারী চোরেদের জন্য।'[৪০]

নাটকের কাহিনি বিশ্লেষণ করে নাটকের বক্তব্য প্রকাশ করা যেতে পারে।

নাটকের কাহিনি শুরু হয় শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্সের ক্লাস রুম থেকে। অধ্যাপক হেনা রায় তার ছাত্রছাত্রী জয়দেব (হেনারই সন্তান), বৃন্দা, সাত্যকি ও শিলাদিত্যের সঙ্গে 'রাষ্ট্র কী?' সে বিষয়ে আলোচনা করতে থাকে। পরীক্ষায় যার উত্তর প্রায় সকলেই মনঃপুত দেয়নি। কার্ল মার্কস রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন—

> 'রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে পীড়ন করিবার যন্ত্র; যে-'শৃঙ্খলা' শ্রেণীসংঘর্ষকে প্রশমিত করিয়া এই পীড়নকে বিধিবদ্ধ করে, সেই কায়েমী 'শৃঙ্খলা' প্রবর্তন করা-ই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।'[৪১]

নাটকের প্রথম দৃশ্যে বৃন্দাও বলেছে—

> 'মার্কস-এর মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে একটা যন্ত্র, যা দিয়ে এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীকে দমন করে।... যেমন পুঁজিবাদী দেশে যে যন্ত্র দিয়ে পুঁজিপতিরা শ্রমিক-কৃষককে দমন করে, তার নাম রাষ্ট্র, আর সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী দমন করে পুঁজিপতিদের।'[৪২]

—এই তত্ত্বই নাটককার শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন এই নাটকে। যাই হোক এই উত্তর অধ্যাপক হেনা রায় সমর্থন করলে শিলাদিত্যর সঙ্গে তা নিয়ে তর্ক বাঁধে। কারণ সে কংগ্রেস যুব-সংগঠনের সদস্য এবং তার মতে মার্কসের কথা কেবল কমিউনিস্টরা স্বীকার করে। এই আলোচনার মাঝেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ অফিসার কৌশিক বসু হঠাৎ কলেজে এসে বেআইনি মাদক দ্রব্য বিক্রি করার অভিযোগে শিলাদিত্যকে গ্রেপ্তার করে। যদিও তার আসল উদ্দেশ্য এই কারবারের আসল মাথাকে ধরার। পুলিশের জেরায় শেষ পর্যন্ত শিলাদিত্য আসল নাম বলতে বাধ্য হয়। এই ব্যবসার মূলে আছে কৌশিক বসুর

স্ত্রী তাপসীর আপন কাকা, বিখ্যাত ব্যবসায়ী রঘুনাথ গাঙ্গুলী। একদিকে মন্ত্রী শ্রীকান্ত মুখার্জি শিলাদিত্যকে ছাড়ার জন্য পুলিশ কমিশনার সুদিন চক্রবর্তীকে চাপ দেয়। শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ চলে বাইরের গুন্ডাদের তান্ডব। নষ্ট হয় কলেজের শিক্ষার পরিবেশ। পুলিশে ফোন করা সত্ত্বেও পুলিশ আসে না। আর অন্যদিকে কৌশিক বসু শিলাদিত্যর বয়ানে রঘুনাথ গাঙ্গুলীকে গ্রেফতার করে এবং যথেষ্ট প্রমাণের সন্ধানে হেনা রায়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে শেষ পর্যন্ত জয়দেব তাকে ভরসা করে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ভারতের বিচার ব্যবস্থার দরুন আদালত থেকে শিলাদিত্য ও রঘুনাথ গাঙ্গুলী উভয়েই জামিনে ছাড়া পায়। মন্ত্রী শ্রীকান্ত, শিলাদিত্য, রঘুনাথ এসে উপস্থিত হয় সুদিনের দপ্তরে। সেখানে শ্রীকান্তর মুখে শুনতে পায়—

> '...আমরা জরুরি অবস্থা জারি করবো খুব শিগগির, সব বিরোধী দলের টুঁটি টিপে ধরবো! আর আপনি যদি বেশি তিকরমবাজি করেন সুদিনবাবু, তাহলে আপনাকে শুদ্ধ মিসাই জেলে আটকাতে আমাদের বেশিক্ষণ লাগবে না!'[৪৩]

শাসক কংগ্রেসের জরুরি অবস্থার রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও পরিকল্পনা ছিল অনেক আগে থেকেই—সে কথার প্রমাণ আমরা ৮ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধিকে দেওয়া সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের চিঠিতে পাই।[৪৪] ষষ্ঠ দৃশ্যেই দেখি মন্ত্রী শ্রীকান্ত, ব্যবসায়ী রঘুনাথ গাঙ্গুলী এবং পুলিশ কর্তা সুদিনের গোপন আঁতাত। তারা একসঙ্গে চক্রান্তের ছক তৈরি করে নিজেদের দুর্নীতি ও ক্ষমতা বজায় রাখতে। সুদিনকে দেখি নির্লজ্জের মতো ঘুষ খেতে। শিলাদিত্য ও রঘুনাথ গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে হওয়া মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং নিজেদের ভবিষ্যতকে স্থিতিশীল করতে জয়দেব ও কৌশিক বসুকে চুপ করানো একান্ত জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। যা বাস্তবায়ন করার জন্য তারা পরিকল্পনা করে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের উত্তপ্ত পরিবেশে মোতায়েন হওয়া দুই কনস্টেবল জীবনানন্দ হালদার ও গিয়াসুদ্দিন মণ্ডলকে হত্যা করে জয়দেবকে ফাঁসানোর। অবশ্য দুই পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করার পিছনেও অন্য কারণ আছে। এরা ছিল পুলিশ ইউনিয়ন তৈরি করার মূল সংগঠক। যে সংগঠন থেকে ৬৪ দফা দাবি পেশ করা হয়েছে। যেখানে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা, 'রাজনৈতিক বন্দীদের হত্যা ও নির্যাতন করতে পুলিশকে নিযুক্ত করা চলবেনা' ইত্যাদি দাবি ছিল। যা সময় থাকতে মিটিয়ে দেওয়া ছিল রাজনীতির কাছে অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অফিসার কৌশিক বসুর নামে মিথ্যা কেচ্ছা সংবাদপত্রে প্রতিনিয়ত ছাপা হবে। যাতে আত্মসম্মানের ভয়ে তাদের মামলা থেকে কৌশিক বসু সরে দাঁড়ায়।

চক্রান্ত অনুযায়ী জীবানন্দ ও গিয়াসুদ্দিনকে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজে ডিউটি দেওয়া হয়েছে। কৌশিকের অনুপস্থিতিতে তার গৃহে একদল গুন্ডা হামলা করে। কিন্তু জীবানন্দ ও গিয়াসুদ্দিন এসে তাপসী ও শমিতকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। তারা সেই সময় ডিউটিতে যাচ্ছিল। সংবাদপত্রে প্রতি নিয়ত কৌশিকের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ ছাপা হচ্ছে—সে চোর, ঘুষখোর, মাতাল, নকশাল নেতা নবারুণ সেনের হত্যাকারী ইত্যাদি। সেজন্য বাড়িতে নেওয়া সমস্ত সংবাদপত্র সে নিজের কাছে রাখে; যাতে তাপসী সেসব খবর পড়ে কষ্ট না পায়। আবার জয়দেবের সহায়তায় কৌশিক রঘুনাথের অনেক দু'নম্বরী ব্যবসার হদিশ পায়। তাপসীও আদালতে তার নিজের কাকা রঘুনাথের অপকীর্তির সাক্ষ্য হতে চায়। এমন সময় শোনা যায় আততায়ীদের আক্রমণে গিয়াসুদ্দিন মারা গেছে আর জীবানন্দ আহত হয়েছে। হত্যা করার সময় আততায়ীরা 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' শ্লোগান দিয়েছে—যাতে এই হত্যার দায় নকশালদের উপর চাপে। কিন্তু কে আসল শত্রু তা চিনতে বাকি থাকে না কৌশিক, তাপসী ও জীবানন্দের।

দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয় মধ্য রাত্রে এবং সেই রাত্রেই চারিদিকে গ্রেপ্তারের অভিযান চলে—সে কথা দ্বিতীয় অধ্যায়েই স্পষ্ট করা হয়েছে। নাটকের অষ্টম দৃশ্যে সুদিনের দপ্তরে রঘুনাথের রক্ষিতা সিলিয়া ও কৌশিকের কথোপকথনে সেই তথ্যের ইঙ্গিত পাই—

'সিলিয়া : আজ রঘুনাথ আমাকে এখানে পাঠিয়েছে একটা কথা জানাবার জন্য—কনস্টেবল হত্যার দায়ে জয়দেব রায়ের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়াছে কিনা।

কৌশিক : সে কি?

সিলিয়া : আর জানতে পারলাম, সেটা আজ বেরোবে। কাল ভোররাত্রে জয়দেবকে অ্যারেস্ট করা হবে।'[৪৫]

এই দৃশ্যেই কৌশিককে বিনা দোষে সাসপেন্ড করা হয়। এবং ভোররাত্রের অপেক্ষা না করেই সুদিন জয়দেবকে গ্রেপ্তার করার অভিসন্ধি করে।

কিন্তু জয়দেবের বাড়িতে পৌঁছানোর পূর্বেই জয়দেব পালাতে সক্ষম হয়। তা জেনে সুদিন ও তার সঙ্গী মহাদেব অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তাণ্ডব শুরু করে। তাদের প্রহারের হাত থেকে বাদ যায় না কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কৃপাসিন্ধু, অধ্যাপক গোবর্ধন ঘোষ, জয়দেবের মা হেনা। জিজ্ঞাসাবাদের অছিলায় আটক করে বৃন্দাকে। অধ্যাপক গোবর্ধন ঘোষকে ভয় দেখানো হয় যে, যদি সে জয়দেবের বর্তমান ঠিকানা না বলে তাহলে তার ২০ বছরের সোমত্ত মেয়েকে ধর্ষণ করা হবে। ফলে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে বলে দেয় জয়দেব বর্তমানে কৌশিক বসুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

দশম দৃশ্য, কৌশিকের গৃহ। জয়দেব গা-ঢাকা দিয়েছে। কৌশিকের সংলাপে জানতে পারা যায় দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। জরুরি অবস্থার স্বরূপ উদঘাটন করে কৌশিক বলে—

> ‘জরুরি অবস্থা! ভারতের সংবিধানটা ছিঁড়ে ফেলে দিল নোংরা কাগজের মতন। সব খবরের কাগজ নাকি সেনসর হবে এর পর থেকে! আজ ভোররাত্রেই নাকি বিরোধী সব লোকসভা সদস্যকে বিনা বিচারে জেলে পুরে দিয়েছে! উত্তর ভারতে নাকি লক্ষ লক্ষ মানুষকে মাটিতে ফেলে জোর করে নাসবন্দি করে দিচ্ছে, নিবীর্য করে দিচ্ছে—যাতে তারা আর সন্তানের জন্ম দিতে না পারে। সাড়া ভারতে মিসায় বন্দির সংখ্যা নাকি সাত লক্ষে ঠেকেছে! পাড়া ঘিরে ঘিরে ছেলেদের গলা কাটছে। অথচ মজাটা কী জান? কাটামুণ্ডু নিয়ে আমাদের সবাইকে হাততালি দিয়ে নাচতে হবে আর গাইতে হবে—ভারত হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র! সত্যি হিটলারকে হার মানিয়েছে মহিলা, এবং তাঁর আদরের পুত্র।’[৪৬]

জয়দেব, কৌশিক ও হেনার মধ্যে কথোপকথনের মাঝে হেনা এসে তাদের জানায় এখানে থাকা তাদের নিরাপদ নয়; যে কোনও মুহূর্তে পুলিশ এখানে আসতে পারে। সেই কথা মতো জয়দেবকে নিয়ে কৌশিক তার উত্তরপাড়ার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। তারপরেই মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে সুদিন সেখানে এসে পড়ে। কৌশিক ও জয়দেব সন্ধান তাপসীকে

জিজ্ঞাসা করে যথাযথ উত্তর না পেলে তারা বাড়ি তল্লাসি করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরোয়ানা ছাড়া সে কাজ করায় তাপসী বাধা দিতে আসলে সুদিন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছে—

> 'কৌশিকের স্ত্রী হয়েও আপনি যে যুগ থেকে এত পিছিয়ে পড়েছেন, এটা আমার কাছে এক বিস্ময়।...পুলিশ কখনো-সখনো তল্লাসি বা গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানার অপেক্ষা করত সেই ব্রিটিশ আমলে। কংগ্রেস শাসনে ওসব খুঁটিনাটি ছুতোনাতার ঝামেলা রাখা হয়নি।'[৪৭]

এই সংলাপে 'মিসা' আইনের ভয়ংকর রূপটি উঠে আসে। অবশেষে তল্লাশি করে জয়দেবের ডটপেন পাওয়া গেলে পুলিশ নিশ্চিত হয়ে যায় যে, জয়দেব এখানে এসেছিল। কিন্তু তার বর্তমান ঠিকানা বলতে তারা অস্বীকার করলে বিনা 'ওয়ারেন্ট'-এ সন্তান সহ তাপসীকে গ্রেপ্তার করে। এই ক্ষমতাও 'মিসা' আইনেরই দান।

জরুরি অবস্থার সময় পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসি গুন্ডারাও একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করে। নেতা-মন্ত্রীদের নির্দেশে কমিউনিস্ট প্রভাবিত এলাকাগুলিতে তারা দল বেঁধে চরম নির্যাতন চালাতে শুরু করে দেয়। একাদশ দৃশ্যে শ্রীকান্ত ও শিলাদিত্যের কথোপকথনে সে কথাই উঠে আসে—

'শ্রীকান্ত : কোলাব্যাং আর বিন্নু গুণ্ডা কাজটা নিখুঁত করেছে হে! কেউ বাঁচেনি। ওপাড়ায় কমিউনিস্টদের বংশে বাতি দেয়ার আর কেউ নেই।

শিলা : একটা করে মুণ্ডু ওড়ে আর ধেই ধেই করে নাচি রাস্তার ওপর। ঘনাটা এমন ইয়ে স্যার, একটা মুণ্ডু হাতে করে নাচছিল। মুণ্ডুটা দেখে চিনেছি স্যার—শ্রীনিবাস লেনের অলক মিত্র, প্রেসিডেন্সির ছাত্র।

শ্রীকান্ত : আজ সকাল থেকেই আমরা ঘাঁটি করে বসে গেছি পাড়ায়। কমিউনিস্টদের আর ফিরতে হবে না ওখানে — এমারজেন্সি জারি হয়ে গেছে। সব জালা শেলে যাবে—

মানে সব শালা জেলে যাবে। আমরা ছাড়া কেউ থাকবে না বাইরে।'[৪৮]

এই দৃশ্যের স্থান সুদিনের দপ্তর। মানে পুলিশ স্টেশন। কৌশিক ও জয়দেবের সন্ধান জোগাড় করায় এখন সুদিন, রঘুনাথ, শ্রীকান্ত ও শিলাদিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেজন্য আটক হওয়া বৃন্দা তালুকদারের উপর মহাদেব অকথ্য অত্যাচার করে, তাপসীকে প্রতিনিয়ত ড্রাগ দেয়। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনও তথ্য তারা বার করতে পারে না। শেষপর্যন্ত তারা কৌশিক ও তাপসীর শিশু সন্তান শমিতকেও ছাড়ে না। তাকে ড্রাগ মিশ্রিত সন্দেশ খাইয়ে আদায় করে নেয় জয়দেব ও কৌশিকের বর্তমান ঠিকানা।

বারো নং দৃশ্য, উত্তরপাড়ায় কৌশিকের পৈত্রিক বাড়ি। আত্মগোপন করে আছে জয়দেব ও কৌশিক। তাদের বাড়ির অবস্থা কী—সে নিয়ে কোনও খবর তারা জানে না। এই বাড়িতে হেনা এসে উপস্থিত হয়। তার কাছে কৌশিক জানতে পারে তাপসী ও শমিতের গ্রেপ্তারের কথা, তাপসীকে লকাপে প্রতিনিয়ত ড্রাগ দেওয়ার কথা। এই নির্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে কৌশিক ক্ষিপ্তের মতো বেরিয়ে পড়ে। এর পরেই সেখানে এসে উপস্থিত হয় মহাদেব, শ্রীকান্ত, শিলাদিত্য। গ্রেপ্তার করে জয়দেবকে। জয়দেবের মুখে এখানেই উচ্চারিত হয় রাষ্ট্রের স্বরূপ প্রসঙ্গটি—যে প্রসঙ্গ দিয়ে নাটকের শুরু হয়েছিল।–

'...কার্ল মার্কস-এর মতে রাষ্ট্র হচ্ছে একটা যন্ত্র যা দিয়ে এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীকে দমন করে।...সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে দমন করে পুঁজিপতিদের, আর এদেশে পুঁজিপতিরা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে দমন করে মেহনতি মানুষকে।'[৪৯]

নাটকের সমাপ্তি ঘটে বেশ নাটকীয়ভাবে। জয়দেবকে পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মহাদেব গুলি করে হত্যা করেছে এবং রটিয়ে দিয়েছে সে ফেরার। আর অন্যদিকে কৌশিক রঘুনাথ গাঙ্গুগুলির সমস্ত ফাইলের বিনিময়ে তাপসী ও তার সন্তান শমিতকে মুক্ত করেছে। নাটকের মধ্যে সুদিন চরিত্রটির 'অ্যালিয়েনেশন ইফেক্ট' ধরা পড়ে। সমগ্র নাটকের মধ্যে তাকে দেখতে পায় মন্ত্রী শ্রীকান্ত ও ব্যবসায়ী রঘুনাথের হয়ে কাজ করতে। সমস্ত রকম চক্রান্ত তার মাথা থেকেই বেড়িয়েছে—যেমন গিয়াসুদ্দীনের হত্যা এবং হত্যার

সময় নকশালপন্থী স্লোগান দেওয়া, সেই হত্যার দায় জয়দেবের উপর চাপানো, শমিতকে ড্রাগ মিশ্রিত সন্দেশ খাওয়ানো ইত্যাদি। কিন্তু এটিই তার সম্পূর্ণ পরিচয় হয়ে থাকেনি। মাঝে মাঝেই তার মধ্যে মানবিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দেবকে গুলি করে মহাদেব হত্যা করেছে বলে সে ক্ষিপ্ত হয়েছে। এমনকি সমগ্র নাটকেই মাঝে মাঝে সে বলেছে, সে প্রথম জীবনে খারাপ অফিসার ছিল না, কিন্তু তাকে এই 'সিস্টেম' খারাপ হতে বাধ্য করেছে। সেজন্যই নাটকের শেষে দেখি কৌশিক নিজেকে 'সারেন্ডার' করে মহাদেবের হাতে নয়, সুদিনের হাতে মরতে চেয়েছে।

উৎপল দত্ত নিজের তিনটি নাটকে তিনভাবে জরুরি অবস্থার ধ্বংসাত্মক রূপ তুলে ধরেছেন। 'লেনিন কোথায়?' নাটকে ব্যবহার করেছেন রাশিয়ার পটভূমি; 'এবার রাজার পালা' নাটকে সরাসরি জরুরি অবস্থার প্রতিবাদ করেছেন ঠিকই, কিন্তু ব্যবহার করেছেন ১৯৪৬ সালের পটভূমি। জরুরি অবস্থা নিয়ে রচিত এটিই তাঁর প্রধান নাটক। এখানেই জরুরি অবস্থার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি তিনি তুলে ধরেছেন, অথচ নাটকীয় গুণকে অক্ষুণ্ণ রেখে। আর 'সাদা পোশাক' হল তাঁর একটি প্রচার মূলক নাটক। এখানে সরাসরি সমকালীন পটভুমি তুলে ধরে নাটকীয়ভাবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোনও কিছুকে তিনি গোপন করার চেষ্টা করেননি।

নরক গুলজার :

মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার' নাটকটি জরুরি অবস্থা ঘোষণার একবছর আগে ১৯৭৪ সালে রচিত হয়েছি। কিন্তু জরুরি অবস্থার সময় ১৯৭৬ সাল নাগাদ তিনি এর পুনরায় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেন।[৫০] ফলে জরুরি অবস্থায় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিফলন এখানে পড়েছে জোরালোভাবে।

তবে 'নরক গুলজার' নাটকটিতে যে কেবলমাত্র জরুরি অবস্থা বা তার পূর্বের ঘটনাই স্থান পেয়েছে তা নয়। নাটককার এখানে চিরন্তন কিছু সামাজিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। নাটকের পটভূমি স্বর্গ, নরক ও মর্ত্য এই তিন পরিসরে বিস্তৃত। আর এই তিন পরিসরের মধ্যে সমাজব্যবস্থার তিনটি স্তর দেখিয়েছেন। এর মধ্যেই সমাজের শোষণের রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। মানিক ও ফুল্লরার মতো সমাজের নিচু তলার মানুষেরা

কীভাবে স্বর্গের শাসক সম্প্রদায় এবং নরকের সমাজ-বিরোধীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত শোষিত হচ্ছে সেই কথায় এখানে ব্যঙ্গের ছলে উঠে এসেছে।

কিন্তু আমাদের গবেষণায় এই নাটকটিকে দেখব জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে জরুরি অবস্থা হঠাৎ করে ঘোষিত কোনও সিদ্ধান্ত নয়। সাতের দশকে দেশীয় ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল জরুরি অবস্থা তারই ফলশ্রুতি। 'গরিবি হটাও' শ্লোগান, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ, সাধারণ মানুষের সামাজিক মানোন্নয়ন ঘটানো ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইন্দিরা-কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অবস্থার উন্নতি ঘটার বদলে অবনতিই বেশি ঘটেছিল। সেজন্য দেশজুড়ে সরকারের বিরুদ্ধে যেসব জনসমাবেশ, জনআন্দোলন, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ হয় তা জোর পূর্বক বন্ধ করার রাস্তা হিসেবেই জরুরি অবস্থার ঘোষণা।

নাটকটিতে স্বর্গ হয়ে উঠেছে দেশের আইন বিভাগ অর্থাৎ সরকার ও তার প্রতিনিধিবর্গ। ব্রহ্মা তার প্রতিনিধিত্ব করে। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় বামনদাস ঘোড়ুই-এর মতো সুদখোর ও মহাজনেরা এবং বাঁটুল বিশ্বাসের মতো পুঁজিপতি ও জননেতারা তৈরি হয় এবং তারা মানিক ও ফুল্লরার মতো সাধারণ মানুষদের শোষণ করে নিজেরা টাকার পাহাড়ে বসে থাকে। আর আছে নেংটিদের মতো মস্তান, যারা নির্ভয়ে চুরি, ছিন্তাই, মানুষ খুন করে। শোষণের বিরাট এই অংশের ভাগ পায় ব্রহ্মার মতো শাসকেরাও। নাটকে তাই ব্রহ্মা নির্দ্বিধায় বলতে পারে—

> '...উৎকোচ ছাড়া আমাদের ইন্‌কামটা কী; অ্যাঁ? আমরা কি খাটি, না এগ্রিকালচার করি, মেশিন বানাই? অতবড় স্বর্গপুরীর এস্ট্যাবলিশমেন্ট কস্‌টটা আসবে কোত্থেকে, অ্যাঁ? বাবুরা সব ভাল ভাল খাবে...ভাল ভাল ঝর্ণায় গা ধবে...ভাল ভাল মৃদঙ্গ চাঁটাবে...ভাল ভাল ইয়েদের নিয়ে ইয়ে করবে!...বরুণবাবুর তো এমনি গরমের ধাত...এয়ারকন্ডিশন একটু বিগড়োলে...ঠাকুর্দা গেলুম...ঠাকুর্দা গেলুম!'[৫১]

এর ফলে মানিক ও ফুল্লরাদের জীবন সমস্ত দিক থেকেই হয়ে উঠে দুর্বিষহ। নাটকের মধ্যে দেখি হাতিবাঁধা গ্রামে ঘোড়ুই মানিকের উপর মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়ে ৭৫০ টাকার দেনা চাপিয়েছে, তার ভিটেমাটি সব কেড়ে নিয়েছে। ফলে মানিক বাধ্য হয়ে পূর্বপুরুষের

গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় শহরে এসেছে। সেখানেও দেখা যায় শোষণের আর এক রূপ। মানিক ফুল্লরার সঙ্গে বিয়ে করেছে, তাদের একটা সন্তানও হয়েছে। অর্থের অভাবে মাথা গোঁজার মতো কোনও ঘর তারা জোগার করতে না পেরে বাধ্য হয়ে শহরের ধারে জলের পাইপের গা-ঘেঁষে পাতানো ঝুপড়ির ভেতর সংসার পেতেছে। মানিক বাঁটুল বিশ্বাসের ঠেলা চালানোর কাজ নিয়েছে। কিন্তু একমাস আগে সেই ঠেলা 'অ্যাকসিডেন্ট' করায় সাড়া মাস ধরে ম্যানেজার মজুরির টাকা কেটে নিচ্ছে। অথচ সেই ঠেলা কেনাই হয়েছিল মানিকের মজুরি কেটে। সংসার চালানোর মতো পর্যাপ্ত টাকা তার কাছে থাকে না। ফলে আক্ষেপের সঙ্গে সে বলেছে—

> 'বলে কি করব? কারে বলব? নইলে ঘোড়ুই আমার জমি ভোগ করে, আর আমারে বলে চোর! তার জাল কেটে বেরিয়ে আসি তো আরেকখানা জাল। শালা বাঁটুল! আমার ঠেলার দাম তোলে আমারই মজুরি কেটে! ওদিকে গাঁয়ের ঠ্যালা...ইদিকে শওরের ঠ্যালা।'[৫২]

আবার এদিকে রাস্তা নির্মাণের কাজ হওয়ায় 'মিউনিসিপালটি' থেকে নোটিশ দিয়ে গেছে, তাদের ঝুপড়ি ভাঙা হবে। একের পর এক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে শেষ পর্যন্ত ফুল্লরা তার সন্তানকে নিয়ে মানিককে ছেড়ে চলে যায় আর মানিক বিষ পান করে আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দেখি, ফুল্লরা নিজের সন্তানকে বাঁচাতে এবং অন্নের সংস্থান করতে শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হয়। কিন্তু সে পথেও তার প্রাণ রক্ষা হয় না। অবশেষে তাকে খুন হতে হয়েছে।

মর্ত্যের এই অবস্থা সাতের দশকের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। সামাজিক শোষণের চূড়ান্ত মাত্রা ছাড়িয়ে ছিল গ্রামে ও শহরে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল অতি ভয়ানক। নাটকেও তাই দেখি নরকপুরীতে 'ওয়েস্টবেঙ্গল সেল'-ই সব থেকে বেশি বিপজ্জনক। কারণ সেটি খুনে, ডাকাত, চোর, জোচ্চর, গুন্ডাতে ভরতি। বাস্তবেও দেখি সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন, পুলিশি অভিযান ছাড়াও সরকারি মদতপুষ্ট গুন্ডাদের বাড়বারন্ত যেভাবে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল তাতে সংকটে পড়েছিল সাধারণ মানুষের জীবনযাপন। অর্থনৈতিক অবনমনের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তাতে সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপ ছিল না। বরং নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য যখন সাধারণ

মানুষ বিক্ষোভ-আন্দোলন-প্রতিবাদ করেছে তখন শাসক শক্ত হাতে তা দমন করার চেষ্টা চালিয়েছে। শাসক একেবারে নিজের বিরুদ্ধে কোনও কথা শুনতে চায়নি। প্রতিবাদের মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে নিজের গদি বাঁচাতে এবং প্রতিবাদকে সম্পূর্ণ শেষ করতে জারি হয়েছে জরুরি অবস্থা। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে নারদের গাওয়া গানটিতে সেসময়ের শাসকের সেই চরিত্রই ধরা পড়ে।—

'কথা বলো না কেউ শব্দ করো না
ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন
গোলযোগ সইতে পারেন না।
একদা ঊষাকালে মজিয়া লীলাছলে
ভগবান বিশ্ব গড়িলেন
কালে কালে জীর্ণ হলো বাগানখানা শুকিয়ে এল
আর জমিদারি দেখতে পারেন না।
ভগবানের ছানাপোনা দেবতা আছেন নানাজনা
আয়েসে ফূর্তি করে ফ্যাট গ্যাদার করছেন...
সব হেলে দুলে চলে
টলমল করে...
অকাজের গোঁসাই তারা কাজের বেলা না।
কথা বলো না কেউ শব্দ করো না
ভগবান বৃদ্ধ হয়েছেন
দায়ভার বইতে পারেন না।।'[৫৩]

নাটকের প্রথম আঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে শাসকের মনোভাব বিশ্লেষিত হয়েছে। ঘোড়ুই ও বাঁটুল বিশ্বাসের মতো লোকেদের মর্ত্যে অর্থাৎ সমাজে অত্যাধিক বাড়াবাড়ির কারণে

সাধারণ জনগণ যখন সন্দেহ করতে থাকে যে, এসব কিছু শাসকের মদতেই হচ্ছে তখন নিজেদের চরিত্র স্বচ্ছ রাখতে শাসক তাদেরকে নরকে অর্থাৎ জেলে পাঠায়। কিন্তু শাসকের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীদের সংখ্যা যখন অতিরিক্ত বেড়ে যায়, তখন সেটা আর নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব থাকে না। সেজন্যই নাটকে দেখি নরকের মধ্যেও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। কারণ নরকে রক্ষীর থেকে ভূতের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তারা নিজেদের ক্ষমতার আস্ফালন দেখাচ্ছে, যমরাজের বারো নং স্ত্রীকে অপহরণ করেছে, বারবার তারা পুনর্জন্ম অর্থাৎ কারামুক্তির দাবি জানাচ্ছে।

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নরকের অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করতে, যমের বারো নং স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চিত্রগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মা নরকের ওয়েস্টবেঙ্গল সেলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা ফাঁপরে পড়েছে। একদিকে নেংটির মতো মস্তান প্রাণের হুমকি দিয়েছে তো অন্যদিকে ঘোড়ুই ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছে পুনর্জন্মের জন্য। শেষপর্যন্ত ভয়ে ও লোভে ব্রহ্মা পুনর্জমের অর্ডারবুকে ব্রহ্মা সই করে দেয়। তাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে চিত্রগুপ্ত মর্ত্যের ভবিষ্যত নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলে ব্রহ্মার বলতে বাধে না—

> ‘পৃথিবী আমার চোখের বাইরে শালা! সেখানে যা হোক আমার দেখার দরকার নেই। মোটকথা আমার গায়ে ছ্যাঁকাটি না পড়লেই হ’লো।’[৫৪]

এই দৃশ্যে আরও কয়েকটি বিষয় চোখে পড়ে। জরুরি অবস্থার সময় সঞ্জয় গান্ধির নেতৃত্বে নগড় সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তার বাস্তবরূপ দিতে দিল্লি সহ একাধিক শহরে বুলডোজার দিয়ে বহু বস্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় প্রশাসন। এর পিছনে থাকা শাসকের মনোভাবের কথা ব্যক্ত হয়েছে ঘোড়ুই-এর কথায়—

> ‘ঘোড়ুই : আচ্ছা হাতিবাঁধার চাষাদের খবর কী? চাষাগুলো আছে, না পালিয়েছে?
>
> ব্রহ্মা : য পলায়িত স জীবতি! কিন্তু কোথায় পালাবে?
>
> ঘোড়ুই : কেন, শওরে! হারামজাদারা তো একটা জায়গাই চেনে। বেগতিক বুঝলেই বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে টেরেনে চেপে বসে

সোজা গিয়ে নামে শ্যালদায়! আর হয়েচে খ্যাঁচাকল শওর! হারামজাদাগুলো চুরি বাটপারি করে...ফুটপাত নোংরা করে, মার্ লাথি...লাথি মেরে ব্যাটাদের গাঁয়ে ফেরত পাঠা, আমার হাতে ফেরৎ পাঠা—'[৫৫]

আবার এদিকে বারো নং স্ত্রীকে উদ্ধার করতে না পেরে নারদকে ছদ্মবেশ পরিয়ে নরকে সেই কাজে সিদ্ধি লাভের প্রত্যাশায় পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাকে নেতার পোশাক পরিয়ে দেবতারা বিপত্তি ডেকে আনে। ফলে নারদ হয়ে উঠে প্রখ্যাত দেশনেতা বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস। যাকে নরকে ধরে নিয়ে আসার জন্য যমরাজকে মর্ত্যে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তার বিপুল ক্ষমতা ও অর্থের কারণে যমরাজ সে কাজে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে। যে দশটি গাড়ি, দশটি বাড়ি, দশটি কারখানার মালিক; যার মস্তান, পুলিশ, জোতদার, ব্লাকমার্কেটিয়াররা ডান-হাত বাঁ-হাত। যে পাবলিককে লাইসেন্সের টোপ দিয়ে, বেকারকে চাকরির টোপ দিয়ে, খরা বন্যায় রিলিফের নামে টাকা লুঠ করে। সেই বাঁটুল বিশ্বাসের চরিত্র ভর করে নারদের মধ্যে। ফলে বিপদে পরে দেবতারা। কারণ যাদের কাঁধে ভর দিয়ে বাঁটুল বিশ্বাস নেতা হয়েছে তাদেরকেই নরকে বন্দি করে রেখেছে। সেজন্য সে পশ্চিমবঙ্গের নব্বই লক্ষ পিশাচকে সংগঠিত করে দেবতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সংকল্প নিয়েছে। যাতে তারা সকলে ছাড়া পায়। নাটকের ঘটনা এভাবেই চরম পর্যায়ে উঠে।

নাটকের অগ্রগতিতে দেখা যায়, বাঁটুল বিশ্বাসের নেতৃত্বে নরকের পিশাচদের আন্দোলন জমে উঠেছে, তারা পুনর্জন্মের দাবিতে উন্মত্ত। এমনকি তারা নিজেদের দাবি আদায়ে স্বর্গের খাবারে বিষ মেশাতেও দ্বিধাবোধ করে না। এদিকে আসল বাঁটুল বিশ্বাসকে যমরাজ আনতে না পেরে মানিককে ধরে এনেছে—যে মর্ত্যের অত্যাচার থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করেছে। এখন সে ব্রহ্মার আশ্রয়প্রার্থী। কিন্তু ব্রহ্মাও অতি চালাকির সঙ্গে তাকে আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে সেই বিপজ্জনক কাজ অর্থাৎ যমের বারো নং স্ত্রীকে প্রথমে উদ্ধার করে আনার শর্ত দিয়েছে।

অন্যদিকে মর্ত্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার পরিবার পরিকল্পনা চালু করেছে। দুটির বেশি সন্তান কোনও পরিবার নিতে পারবে না। আর তা বাস্তব রূপ দিতে

'ভেসেকটমি' অর্থাৎ নির্বীজকরণ শুরু হয়েছে। সুতরাং নরকবাসীদের একসঙ্গে পুণর্জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হয়েছে। ফলে কে আগে পুনর্জন্মের সুযোগ পাবে সেই নিয়ে ঘোড়ুই, নেংটি, পান্নালাল, খগেনের মধ্যে শুরু হয়েছে কোন্দল। কিন্তু বাঁটুল বেশী নারদ ভালোভাবেই জানে এই সব সুদখোর, মহাজন, মস্তান, কালোবাজারীর দল, ঘুষখোর পুলিশ একা একা মর্ত্যে গিয়ে কিছুই বাগে আনতে পারবে না। তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। অতএব নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে গেলে তাদের প্রত্যেককে একসঙ্গে পুনর্জন্ম পেতে হবে। নারদ ওরফে বাঁটুল বলে উঠে—

> 'বানচাল করছে...ডিভিশন ক্রিয়েট করে মুভমেন্ট খতম করছে! ইডিয়ট! মাথায় এটা নেই, একা কি দোকা গিয়ে আমরা কেউ করে খেতে পারব না!...আ ব্ল্যাকমার্কেটিয়ায়ার উইদাউট খচো (ঘুষখোর পুলিশ) ব্যাকিং হিম। ইজ ওনলি এ ফেকলু!...আমি বাঁটুল বিশ্বাস, আই অ্যাম ইওর লিডার...ইচ্ছে করলে তোদের সব কটাকে ফেলে সবার আগে আমি চলে যেতে পারতাম...বাট আই ওন্‌ট। বিকজ আই নো, এ লিডার উইদাউট মস্তান, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার এন্ড এ গুরু বিহাইন্ড হিম, ইস নাথিং বাট এ ফেকলু!...আমাদের একজনের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে আর একজনের প্রতিষ্ঠার ওপর। এ চেন...এ লং চেন!'[৫৬]

শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মানিকদের মতো সাধারণ গরীব মানুষদেরও প্রয়োজন। কারণ এই মানিকরায় ঘোড়ুইদের জমি চাষ করে, বিপদে পড়ে চড়া সুদে টাকা ধার নেয়; গুইবাবাদের মতো ভণ্ড ধর্মগুরুরা এদেরকেই বোকা বানিয়ে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে; পান্নার গুদামে এবং বাঁটুলের কারখানায় এরাই কাজ করে; বাঁটুল এদের জীবন উন্নত করার আশ্বাস দিয়েই দেশনেতা হয়; খগেনের মতো ঘুষখোর পুলিশরা এদের টাকাতেই নিজেদের পকেট ভরে। তাই এমন সময় মানিক ব্রহ্মার দেওয়া শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে নরকে প্রবেশ করলে তাকে এরা পুনর্জন্ম নিতে বাধ্য করার জন্য আটক করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে—জরুরি অবস্থা জারির অন্যতম কারণ ছিল 'জ. পি. আন্দোলন'। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রীত্ব বাতিল হওয়া সত্ত্বেও সে গদি ছাড়েনি। তার বিরুদ্ধেই জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে

দেশজুড়ে আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে জারি হয়েছিল জরুরি অবস্থা। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে টেলিফোনের মতো অদ্ভুতদর্শন একটি যন্ত্রে ব্রহ্মা যখন কথা বলছিল, সেখানে এই প্রসঙ্গের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই কথোপকথনে উঠে আসে, ব্রহ্মা স্বর্গের সংবাদপত্র 'স্বর্গবার্তা' পড়ছিলেন, কিন্তু কোনও খবর তার মনঃপুত না হওয়ায় সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়ার কথা চিন্তা করছে। ওদিকে নরকের পিশাচেরা স্বর্গ আক্রমনের পরিকল্পনা করছে এবং তা শুনে ইন্দ্র, বরুণ সব দেবতারা স্বর্গ থেকে পালিয়েছে। এতে আতঙ্কিত হয়ে ব্রহ্মা বলেছে—

> 'উঃ কী সৃষ্টি করেছিলাম...আমার সৃষ্টি আমার গুষ্টির তুষ্টি করতে ধেয়ে আসছে! মাথাফাতা গেল! চিতু! চিতু! অবস্থা হাতের বাইরে...হ্যাঁ, জরুরি অবস্থা! তুমি চলে এসো...'।[৫৭]

নাটককার জানেন সমাজের এই অন্ধকার সময়কে কাটিয়ে দিতে পারে একমাত্র সাধারণ মানুষের সাহসী লড়াই। সেজন্যই নাটকের অন্তিম পর্যায়ে মানিককে দেখি লড়াই করতে। সমগ্র নাটকজুড়ে যে মানিককে ঘোড়ুই, নেংটি, বাঁটুল, পান্না, গুঁইবাবা, খগেনের মতো শোষকের হাত থেকে রক্ষা পেতে পালাতে দেখি, সেই মানিকই শেষপর্যন্ত এদের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে লড়াই করেছে। মানিক ও ফুল্লরা দুজনে মারা গেলেও তাদের সন্তান এখনও বেঁচে আছে সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে। যে ভবিষ্যতের সুস্থ সমাজের প্রদীপ। কিন্তু তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখার দায়িত্ব বর্তায় মানিক ও ফুল্লরাদের উপরেই। সেজন্যই নাটকের শেষ দৃশ্যে নরকের মধ্যে মানিক ও ফুল্লরার মিলন ঘটেছে। কিন্তু শেষ লড়াইটা করতে হবে মর্ত্যে, নরকে নয়। তাই নারদের অভিসন্ধিতে মানিক ও ফুল্লরার 'রিবার্থ' বা পুনর্জন্ম হয়েছে। মানিক সংকল্প নিয়েছে—

> 'জ্যান্ত শয়তানের থাবা থেকে ছেলেডারে বাঁচাতে হবে...পিথিবীরে বাঁচাতে হবে। জ্যান্ত নেকড়ের দাঁত ভাঙতে হবে।'[৫৮]

অবশ্য বাকি নরকবাসীদের সঙ্গে ব্রহ্মা, চিত্রগুপ্ত, যমকেও মর্ত্যে পাঠানো হয়েছে; কিন্তু তাদেরকে মানুষের জন্ম দেওয়া হয়নি, দিয়েছে গোরুর জন্ম। কারণ এই সব শাসক ও শোষক যারা এতদিন সমাজে মানিক ও ফুল্লরার মতো সাধারণ মানুষকে শোষণ করে

এসেছে অথচ সমাজের আসল কাণ্ডারী সেই শোষিত মানুষেরাই; সুতরাং ভবিষ্যতের সুস্থ পৃথিবীতে মানুষই হবে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী আর এরা নিয়োজিত হবে তাদের সেবায়।

নিজবাসভূমে :

জরুরি অবস্থার পটভূমিতে নাটককার অমল রায়ের লেখা 'নিজবাসভূমে' একাঙ্কটির শুরুতেই নেপথ্য কণ্ঠ্য মারফত স্পষ্ট করা হয়েছে—

> '...যখন স্বৈরাচারী এক দানবীয় জিঘাংসার শাণিত নখরাঘাতে সারা দেশ ছিন্নভিন্ন—রক্তাক্ত; যখন সারা দেশ জুড়ে এক বিশাল বন্দীশিবির 'স্বাধীনতা' শব্দটিকেই ব্যাঙ্গ করছে—সেই কালো অন্ধকার জরুরী অবস্থার সন্ত্রাস শাসিত পটভূমিতেই আমাদের নাটকের বিস্তার।...এ নাটকের সময়—১৯৭৬ সাল, যখন অত্যাচারিত পশ্চিমবাংলার বহু রাজনৈতিক কর্মী এলাকা ছাড়া, গৃহহীন, পলাতক, নিরাশ্রয়'।[৫৯]

এবং নাটকের উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> 'আমরা শুধু স্বৈরাচারী ঘাতক বাহিনীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতেই চাই না, তার সঙ্গে চিনে নিতে চাই সেই সব ভণ্ড বেইমান ক্লীব নপুংসকদের, যাদের কাপুরুষ চক্রান্তের পথ বেয়েই ঐ হত্যাকারীর দল ক্ষমতায় এসেছিল, যাদের হীন স্বার্থসিদ্ধির যূপকাষ্ঠে সেদিন বলি হয়েছিল মানবমুক্তির শাশ্বত স্বপ্ন। তাই এ নাটকের বর্শামুখ শুধু ফ্যাসিস্ত লুটেরা ও খুনিদের বিরুদ্ধেই নিবদ্ধ নয়, এ নাটক আক্রমণ শাণিয়েছে সংশোধনবাদী ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধেও।'[৬০]

নাটকটির কাহিনিতে দেখা যায় সি. পি. আই. (এম.)-এর নেতা সুগত, বিদ্যুৎ, রফিক, প্রশান্ত, সমীরণ ও অনির্বান দেশে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার কারণে গৃহছাড়া। তারা জরুরি অবস্থার সন্ত্রাস থেকে নিজেদের বাঁচাতে শহর থেকে দূরে একটি নিভৃত স্থানে ভগ্নপ্রায় গীর্জায় আত্মগোপন করেছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি জরুরি অবস্থায় সারা দেশজুড়ে 'মিসা' আইনের দ্বারা বিরোধী নেতাদের বিনা বিচারে কারাবন্দি

করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেও সেভাবে গ্রেপ্তার ও খুন হতে হয়েছিল বহু কমিউনিস্ট নেতাদের। কারণ তারাই তখনকার সরকারের সবথেকে বড় বিরোধী সংগঠন। ঘটনার সেই জায়গা থেকেই নাটকের উপজীব্য গৃহীত। কমিউনিস্ট কর্মীদের দেখলেই কীভাবে পুলিশ ও কংগ্রেসি গুন্ডারা তাদের উপর হামলা চালাত তার একটি চিত্র নাটকের শুরুতেই ধরা পড়ে নান্টু হত্যার মধ্যে। '—দেখুন, সত্যি বলছি—বাহাত্তরের ইলেক্শনের পর থেকে আমি আর কোনো ঝামেলায় নেই, বিশ্বাস করুন—শুধু মাকে দেখতে এপাড়ায় এসেছি—পায়ে পড়ি আপনাদের, আমায় মারবেন না'[৬১]—নান্টুর এরকম কাতর অনুনয় সত্ত্বেও কংগ্রেসি গুণ্ডাদের হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হয়।

নাটকটিতে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট যেমন আছে, সেরকম আছে কমিউনিস্ট নেতাদের আত্মসমালোচনা। এরকম পরিস্থিতিতে কেউ কেউ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়ার জন্যও অনুশোচনা বোধ করেছে—যেটা সন্ত্রাসের পরিবেশে অনেকের হওয়া খুব স্বাভাবিক। যেমন নাটকে প্রশান্ত। পালিয়ে পালিয়ে জীবন রক্ষা করতে সে বীতশ্রদ্ধ। সে একসময় ছিল শ্রমিকনেতা, বিপ্লবের কথা বলত। কিন্তু জরুরি অবস্থার পরিবেশে সে নিজের বলিষ্ঠ চরিত্র ধরে রাখতে পারেনা। বাড়ির একমাত্র আর্নিং মেম্বার হাওয়াই পরিবারের চিন্তা তাকে বারবার বিদ্ধ করে। রফিক তাকে ভবিষ্যতের আশার কথা শোনাতে গেলে সে হতাশ হয়ে বলে ওঠে—'শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না! ওঃ কেন যে এইসব রাজনীতি করতে এসেছিলাম!'[৬২] দুবার মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেলেও সে সমাজ বদলানোর তাগিদে প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেও অনুশোচনাও বোধ করে। এমনকি এরকম পরিস্থিতিতে ভাবতে আরম্ভ করেছে ভারতবর্ষে বিপ্লব ও কমিউনিজম আসা অসম্ভব। তার এই চিন্তা তৎকালীন অনেক বিরোধী নেতাদের ভাবনাকে নির্দেশ করে।

একুশ মাস বহাল থাকা জরুরি অবস্থার একটি রাত্রি নাটকটির কাহিনির পরিধি। কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতাদের কথোপকথনে উঠে এসেছে জরুরি অবস্থার রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা এবং পূর্বে তাদের গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিচ্যুতি। জরুরি অবস্থায় কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেফতার হলে প্রথমেই ভেঙে যায় শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলন। যে খবর শুনে হতাশ হয়ে সমীরণ বলে—

'আসলে আমরা শুধু পাইয়ে দেবার আন্দোলন করেছি, শ্রমিকদের বিন্দুমাত্র রাজনৈতিকভাবে সচেতন করিনি, তারই ফল এটা।'[৬৩]

পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বরা এই সময় নিষ্ক্রিয় হয়েছিল, আন্দোলন সংগঠিত করতে ভয় পাচ্ছিল, কবে ইলেকশন ঘোষণা হবে এবং ইন্দিরা গান্ধিকে নির্বাচনে পরাজিত করবে তার দিন গুনছিল—সেই সব নেতাদের প্রতিও তাদের চাপা ক্ষোভ বেড়িয়ে এসেছে। তাদের কথোপকথনে শীর্ষ নেতাদের প্রতি অভিযোগ প্রকাশ পেয়েছে—

'বিদ্যুৎ : অথচ এত অত্যাচার বাড়ছে, তবু কোথাও প্রতিরোধে ইঙ্গিত নেই! জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত, আর জনগণের নেতারা পলাতক রণক্ষেত্র ছেড়ে! কী করে হয় এটা?

সমীরন : নেতারা ড্রইংরুমে বসে আবার কবে ইলেকশন হবে তার আশায় দিন গুনছে!

বিদ্যুৎ : অসম্ভব, এদের দ্বারা বিপ্লব হবে, না কচু!

সমীরণ : না, তা নয়! আমি জানতে চাই বুঝতে চাই জরুরি অবস্থার জগদ্দল পাথর বুকের ওপর চেপে বসে রয়েছে—এখনই তো সময়—প্রতিরোধ-সংগ্রাম গ'ড়ে তোলার। অথচ নেতারা হাত পা গুটিয়ে বসে রয়েছে, নির্বাচনী খোয়াব দেখছে, কেন—কেন এটা হবে? ঐ জায়গায় জয়প্রকাশ নারায়ন, মোরারজি দেশাইদেরও যতটুকু সাহস আছে রুখে দাঁড়াবার—এদের তাও নেই কেন?

রফিক : একটা প্রশ্ন কি কখনো তোমার মনে আসেনা কমরেড, যে ইন্দিরা—জয়প্রকাশ-মোরারজি-বাজপেয়িদের মত মার্কা মারা দক্ষিণপন্থী লোকেদেরও জেলের ভেতর পাঠিয়েছে, সেই ইন্দিরা আমাদের পার্টির বিপ্লবী নেতাদের বাইরে ছেড়ে রাখে কেন?'[৬৪]

ঘটনার অগ্রগতিতে দেখা যায় কান্তি (বিল্টুর দাদা তথা সমীরণের মাসতুতো ভাই) ঘটনাচক্রে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। রাত্রের অন্ধকারে তাকে চিনতে না পেরে আই.বি.-এর লোক ভেবে সমীরণ, রফিক, বিদ্যুৎ খুন করতে উদ্যত হয়। অবশেষে সেই ভুল ভাঙলে তারা লজ্জিত হয়। সমীরণ সেসময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির চরম কথাটি বলে—'আসলে দিনরাত একটা চাপা আতঙ্কের মধ্যে থাকতে থাকতে আমাদের কারুরই মাথা ঠিক নেই! শত্রু-মিত্র ভেদরেখা গুলিয়ে গেছে!'[৬৫] এই ভ্রান্তি সমগ্র সাতের দশকের রাজনীতির একটি অন্যতম সত্য। ভিন্ন আদর্শ নিয়ে কেউ রাজনৈতিক সংগ্রাম করলেই অপর পক্ষের কাছে সে শত্রু বলেই চিহ্নিত হত। তাতে তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। সেজন্যই লক্ষ করা যায় কমিউনিস্ট শিবিরে শ্রেণিসংগ্রামকে কেন্দ্র করে একাধিক বিচ্যুতি ও ভাঙ্গন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে শত্রু বলেই মনে করেছে। কান্তির ভাই তথা সমীরণের মাসতুতো ভাই বিল্টু—যে নকশাল করত বলে সমীরণ, বিদ্যুৎ প্রমুখ সি.পি.আই.(এম) কর্মীরা তাকে নিজেদের শত্রু মনে করেছিল। সেই শত্রুতার জিগির এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে শেষ পর্যন্ত তারা বিল্টুকে হত্যা করে। পূর্বেই বলেছি নাটকটি একটি আত্মসমালোচনার নাটক। জরুরি অবস্থায় যখন সি.পি.আই.(এম) কর্মী-সমর্থকরা সংকটে পালিয়ে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করছে, তখন তাদের ফেলে আসা অতীতের রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তগুলির কথা মনে পড়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী নকশালদের তারা শত্রু ভেবেছিল, ইন্দিরা গান্ধিকে তখন তাদের বেশি সঠিক মনে হয়েছিল। সেই ইন্দিরার ঘোষিত জরুরি অবস্থায় যখন তারাই সবথেকে বেশি বিপদে পড়ে তখন তাদের মনে হয়েছে বিল্টুর মতো নকশালদের আক্রমণ করাটা তাদের রাজনৈতিক জীবনের সবথেকে বড় ভুল ছিল। তাই তাদের 'ইলিউশনে' বিল্টু এসে যা বলেছে তা তাদেরই আত্মপাঠ।–

> '...ফ্যাসিবাদ কাউকে ছাড়ে না, সে আগে মারে কমিউনিস্টদের—তারপর অন্য সবাইকে—'।[৬৬]

নাটকের পরবর্তীতে কান্তীর সঙ্গে সমীরণ প্রমুখের কথোপকথনে বিল্টু হত্যার কাহিনি উঠে আসে। সমীরণের কাছে রাজনৈতিক শিক্ষা নেওয়া বিল্টু প্রথম দিকে তাদের সঙ্গেই পার্টি রাজনীতি করতো। কিন্তু সি. পি. আই. (এম)-এর সংশোধনবাদী নীতি গ্রহণের জন্য বিল্টু নকশাল রাজনীতির পথে অগ্রসর হয়। বিল্টুর কথায় শোনা যায়—

'...ওরা [সি.পি.আই.(এম) কর্মী সমীরণ প্রমুখরা] কমিউনিস্ট নয়। ওরা মন্ত্রীত্বের লোভে গণ আন্দোলনকে বিসর্জন দিয়েছে, গদি রাখার জন্য নকশালবাড়ির চাষিদের ওপর গুলি চালিয়েছে, ওদের মগজটাই এখন একটা ভোটের বাক্স, মার্কসবাদের বদলে ব্যালট পেপারে ভর্তি—

...

সমীরণদারা আজ সংশোধনবাদের পচা পাঁকে ডুবে গেছে, শান্তিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের ফেরিওয়ালা, শাসকশ্রেণীর ঘৃণ্য দালাল বনেছে—'[৬৭]

সমীরণদের বর্তমান অবস্থার কারণ যে তাদের নেওয়া পূর্বসিদ্ধান্ত গুলোই সেকথা কান্তিও বলেছে। কারণ সি.পি.আই.(এম) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ভি.ভি. গিরিকে, কংগ্রেস ভাগের সময় মোরারজি দেশাইদের বাদ দিয়ে ইন্দিরা গান্ধিকে সমর্থন করেছিল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তারা ইন্দিরা গান্ধির পাশেই দাঁড়িয়েছিলো—এরকম প্রথম থেকেই বারবার সমর্থন ইন্দিরা গান্ধির স্পর্ধা বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেক গুণ। যার ফলে তিনি পরবর্তীতে আর কোনও বিরোধিতা সহ্য করতে পারেননি। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন বারবার। সেজন্য জরুরি অবস্থা জারি করারও সাহস পেয়েছেন। তাই সি.পি.আই.(এম) যখন বিরোধিতা করেছে তখন তারাও আক্রান্ত হয়েছে। একথা হয়ত কিছুটা সত্য এ কারণে যে, বারবার সমর্থন ইন্দিরা গান্ধিকে 'ফ্যাসিস্ট'-এ পরিণত করে। কিন্তু নাটককারের কথা অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধিকে বাদ দিয়ে মোরারজি দেশাইদের মতো দক্ষিণপন্থী নেতাদের সমর্থন করাও খুব একটা সঠিক সিদ্ধান্ত হত না, যা আমরা জরুরি অবস্থার পরবর্তীতে তাদের রাজনীতিতে দেখেছি। সেজন্যই মাত্র আড়াই বছরে মোরারজি দেশাই-এর সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়।

শেষপর্যন্ত সমীরণদের বর্তমান কর্তব্য সম্পর্কে কান্তি যা বলে তা আসলে নাটকারেরই কথা। প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে কিছুই বাঁচানো যায় না, রুখে দাঁড়িয়ে সব রক্ষা করার বাণী কান্তির মুখে শোনা যায়—

'ঝড় আসছে ভাইয়েরা আমার, প্রলয়ঙ্কর ঝড়—যে ঝড়ে উড়ে যাবে স্বৈরতন্ত্রের আবর্জনা—আর বেইমানীর ভস্মরাশি দিকচিহ্নহীন মহাশূন্যে;

তোমরা নিজের হিম্মতে এই ঝড়ের সমুদ্র পেরিয়ে ফিরে যাও আপন দেশে, ছেড়ে আসা নিজের ঘরে—'[৬৮]

এই পন্থাই পারবে জরুরি অবস্থার জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে ফেলতে। তাই সমীরণদের আত্মগোপন করা গির্জার ফাদারের 'লেট দেয়ার বি লাইট, মাই বয় লেট দেয়ার বি লাইট' উক্তিতে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

বদলা :

অমল রায়ের 'বদলা' নাটকে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু খুব সামান্য—একেবারে শেষ পর্যায়ে। আসলে অমল রায়ের বেশিরভাগ নাটকই নকশাল আন্দোলনের আদর্শে লেখা সেকথা চতুর্থ অধ্যায়েই বলা হয়েছে। এই নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও শ্রেণিঘৃণা উদ্রেক করার চেষ্টাই করা হয়েছে। নাটকে মোট ছয় জন অভিনেতা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছে। নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়, একটি ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা লোককে (মি. সেন) ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ব্যক্তি টানতে টানতে নিয়ে আসে খুন করার উদ্দেশ্যে। এই লোকটি অর্থাৎ মি. সেন ৪র্থ-এর মাসতুতো ভাই বিকাশকে হত্যা করেছিল, কারণ বিকাশ তার কারখানায় জঙ্গী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। লোকটির কুকর্মের তালিকা অনেক লম্বা—চাকরির লোভ দেখিয়ে অনেক অসহায় মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করেছে, কারখানার শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি কোনও দিন দিত না, পুলিশকে টাকা খাইয়ে ৩য় ব্যক্তির ভাই বিল্টুকে খুন করিয়েছে, ১ম ব্যক্তিকে মিথ্যা কেসের দায়ে সাত বছর জেল খাটিয়েছে, ২য় ব্যক্তিকে ঘরছাড়া করিয়ে তার পরিবারকে ধংস করেছে। ফলে প্রত্যেকে উন্মত্ত হয়ে আছে তাকে হত্যা করতে। কিন্তু নাটকের ৫ম ব্যক্তি, যে আসলে ৪র্থ ব্যক্তির মেসোমশাই এবং বিকাশেরই বাবা—সে চায় না তাকে হত্যা করতে। কারণ সে মনে করে মানুষ মারা পাপ, সে বিশ্বাস করে হৃদয় পরিবর্তনের তত্ত্বে। তখন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ৫ম ব্যক্তিকে বাকি চারজন ইতিহাসের তিনটি গল্প বলে তার এই ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করেছে। তাকে বোঝাতে চেয়েছে, এই সব শ্রেণিশত্রুরা চিরকালই সাধারণ মানুষকে শোষণ করেছে। আর সেই শোষণের বিরুদ্ধে যখন সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করে তখনই হিংসাত্মক পন্থায় এরা তা দমন করে। ফলে এই সব চরিত্রের কোনও পরিবর্তন ঘটে না।

এখানে যে তিনটি গল্প বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম দুটি হল ১৮৩২ সালের ওয়াহাবী বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন ৫ম ব্যক্তির মনে শ্রেণিঘৃণার উদ্রেক হয়না তখন তাকে শোনানো হয় বিকাশের হত্যার গল্প। যাকে জরুরি অবস্থার সময় কারখানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে মি. সেন অপহরণ করে নির্মমভাবে হত্যা করে। সে কথা শুনে ৫ম ব্যক্তি আর নিজের ক্রোধকে ধরে রাখতে পারে না—হত্যা করে মি. সেনকে।

নানা হে :

দিব্যেশচন্দ্র লাহিড়ীর 'নানা হে' (১৯৭৭) নাটকটিকে বহরমপুরের 'প্রান্তিক' নাট্যগোষ্ঠী ২২ জানুয়ারি ১৯৭৮-এ সফলতার সঙ্গে প্রযোজনা করে মফস্‌সলের রাজনৈতিক থিয়েটার চর্চায় মাইলস্টোন হয়ে আছে। সাতের দশকেই এটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তিক কর্তৃক ৩২ বার এবং মালদা ড্রামালীগ কর্তৃক ৯ বার প্রযোজিত হয়েছে।[৬৯] নাটকটির শুরুতে নাটককার বলেছেন—

> 'একাঙ্কটি মালদহের গম্ভীরা-শিল্পীদের নিয়ে। গম্ভীরা গান মালদহের ঐতিহ্যপূর্ণ নিজস্ব লোক-সংস্কৃতি। গম্ভীরা-শিল্পীদের চিরন্তন দুঃখ দুর্দশা সংগ্রাম, জরুরী অবস্থাকালে তাদের ভূমিকা এবং স্বৈরতন্ত্রের অপশাসন ও কুফল এই নাটকের বিষয়বস্তু।'[৭০]

মালদহের ভাষায় রচিত এই নাটকে গান ও নাচ গম্ভীরার সুরে ও ঢঙে পরিবেশিত। নাটকের কাহিনির পরিধি একরাত্রি। নাটকের চরিত্র জগা মাস্টারের দল গম্ভীরা পরিবেশন করে। সেই গম্ভীরা পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে উঠে আসে জরুরি অবস্থার করাল ছায়া কীভাবে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করেছিল, শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে কীভাবে বন্দি করতে চেয়েছিল তার দৃশ্য। নাটকটিতে কাহিনির দুটি অবস্থান আছে। একই সঙ্গে দর্শক সমাজ জগার দলের গম্ভীরা নাট্যগীতের দর্শক, আবার তাদের সমগ্র জীবনচিত্র নিয়ে রচিত নাটকেরও দর্শক। একই সঙ্গে গম্ভীরা গীতে উঠে আসে জরুরি অবস্থার ভয়াবহতার কথা, আবার উঠে আসে তাদের স্বাভাবিক জীবনে জরুরি অবস্থার সর্পিল প্রভাবের কথা। ফলে দর্শক গম্ভীরার গানে ও তাদের বাস্তব জীবনে একসঙ্গে

দেখতে পায় জরুরি অবস্থা। নাটকের চরিত্রের মধ্যে আছে জগা, মন্টু, কপিল, শীতল ও গম্ভীরার শিব তথা নানা। কাহিনির আবর্তে জগা, মন্টু, কপিল, শীতল-ই বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। আর মঞ্চের পিছনে থাকে কয়েকজন বাদক ও গায়ক।

নাটকের শুরুতে দেখি মণ্টু, কপিল, শীতল দর্শকদের সামনে গম্ভীরা প্রদর্শন করছে এমন সময়ে গম্ভীরার আরাধ্য দেবতা নানা অর্থাৎ শিব সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তাকে জগা সহ সকলে নিজেদের নিত্যদিনের দুঃখ-যন্ত্রনার কথা বলতে থাকে। সেই কথার মধ্যে ফুটে উঠে তৎকালীন সমাজচিত্র। দেশের স্বাধীনতা ত্রিশ বছরে পৌঁছালেও, রাজনেতারা বারবার উন্নতির আশা দিলেও তার তেমন কোন বাস্তব রূপায়ণ ঘটে না। অন্ন-চিকিৎসা-কর্ম কোন কিছুরই সংস্থান হয়নি তেমনভাবে। নাটকের দ্বিতীয় গানে সেই কথাই ধরা পড়ে—

> ‘নানা বলবো ক্যামন কর‍্যা হায়,
>
> মনের দুঃখে কল্‌জ্যা ফাটে যায়।
>
> কত আশা দিলে, ওয়াদা করলে
>
> তিরিশ বছর ধর‍্যা হায়—
>
> আবার কিছু চাহালে, খ্যাতে মিলে
>
> শুধু আখার চায়।।
>
> চাল ডাল নুন ত্যাল
>
> খায়া হলো বারোহাল
>
> আগুন যে দাম,
>
> লোকে পড়হ্যা শুনহ্যা চাকরি পায় না
>
> বিধি হলো বাম।
>
> কিছু বলল্যা পরে, মিসায় ধর‍্যা
>
> চালান কর‍্যা দ্যাও যে হায়—

মনের দুঃখে কল্‌জ্যা ফাটে যায়।।'[৭১]

এরপর গম্ভীরা দলপতি জগা মিনিস্টারের চরিত্রে ও ভঙ্গিতে কথা বলে আর বাকিরা দেশের যুব সমাজে পরিণত হয়। জগার কথায় ধরা পড়ে, বর্তমানে শিক্ষিত যুব সমাজের ডিগ্রীর কোন দাম নেই, নেই কোন বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান। চাকরির জন্য চায় ঘুষ। সে বলতে কোন কুণ্ঠাবোধ করে—

> 'যুবশক্তিই দ্যাস...যুবশক্তিই প্রাণ...হামি তোমাদের মন্ত্রী... তোমাদের সেবার লেগে হামি সব মদের দোকান চব্বিশ ঘণ্টা খুলা রাখার ও ফিরি দিবার অর্ডার দিয়া দিয়্যাছি।'[৭২]

আসলে নেতাদের ভাষণে আর কাজে যে অন্তর থাকে, সে দিকে দৃষ্টি রেখেই নাটককার নেতাদের ভদ্রবেশী বাচনভঙ্গিকে সরিয়ে বসিয়েছেন তার প্রকৃত স্বরূপের ভাষণ।

জরুরি অবস্থা চলাকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধির পুত্র সঞ্জয় গান্ধি পরোক্ষভাবে সমস্ত ক্ষমতার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। পরিবার পরিকল্পনা ও বৃক্ষরোপণের নামে চলে দেশের সাধারণ মানুষের নিবীর্যকরণ এবং বসতি ধ্বংস। 'নানা হে' নাটকে সেই কথা আমরা লিপিবদ্ধ হতে দেখি। সঞ্জয় গান্ধিকে এই সময় প্রচার করা হয়েছিল দেশের যুবরাজ আখ্যায়। মণ্টু চোখে চশমা এঁটে সঞ্জয় গান্ধির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং জগা তাকে ভূষিত করে 'জনগণমন অধিনায়ক ভারত ভাগ্য বিধাতা যুবরাজ শাহেনশাহ্ তখ্‌তে হাউস শ্রীল শ্রীযুক্ত' বলে। শীতল, মণ্টু, জগা, কপিলের সংলাপে উচ্চারিত হয় 'হাম দো—হামারে দো' প্রচারমন্ত্র। কেও অভাবের কথা বললে মণ্টু বৃক্ষরোপণ করতে বলে, আবার কারো দোকান গুন্ডারা ভেঙে দিলে বলে পণপ্রথা তুলে দেওয়ার কথা। এমনকি মণ্টু ওরফে সঞ্জয় গান্ধি নানাকে পর্যন্ত নিবীর্যকরণের জন্য ভ্যাসেকটমি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিতেও পিছপা হয়না। এসব ঘটনা দেখে নানা বলে, 'ওহ, ডেঞ্জারাস! সত্যি সত্যি এসব হয় নাকি?'[৭৩] তখন জগা, কপিল, মণ্টু ও শীতল নানাকে উদ্দেশ্য করে যে গান ও সংলাপ বলে তা আসলে তৎকালীন শাসক শ্রেণির উদ্দেশ্যেই বলা—

'রাজগদ্দিতে বস্যাছ আজ, কার সুখের জন্যে

তোমার ভারাটিয়া জহ্লাদেরা আহ্লাদে আটখান হে।।

কেনে গলা টিপে মারে, অনাহারে ল্যাংটা কর‍্যা

শিয়াল শকুনের সামনে হামাদের ন্দিয়াছ ছাড়্যা—

হামাদের দিয়াছ ছাড়্যা।

(বলি) শাসনের নামে বেইমানি কর‍্যা আর কতদিন চলবে হে—

কার সুখের জন্যে।।'[৭৪]

অথবা—

'কপিল : তুমি অন্ধ বধির নিষ্ঠুর নির্মম।

মণ্টু : তুমি অত্যাচারী—প্রজাপীড়ক।

শীতল : তুমি স্বৈরাচারী—শোষক।'[৭৫]

জরুরি অবস্থার সময় সরকার প্রত্যক্ষভাবে জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করতে কখনও সেন্সরশিপ চাপায়, আবার কখনও পরোক্ষভাবে পুলিশ ও কংগ্রেসি গুন্ডা লেলিয়ে দেয়। এসময় বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়েছিল শিল্পী-সাহিত্যিক-নাট্যকর্মীরা। তারা যে কীভাবে বিপাকে পড়ে তার কথা এ নাটকে উঠে এসেছে। জগা, শীতল ও নানা গম্ভীরা গান ও পালায় সরকারের নীতির বিরোধিতা করতে থাকলে সেখানে হাজির হয় পুলিশ ও মাস্তান। তারা গম্ভীরা শিল্পীদের গানের খাতা কেড়ে নেয়, 'মিসা'-য় গ্রেপ্তার করার হুমকি দেয়। তাদের বিদ্রোহমূলক গান করার বদলে সরকারের বন্দনামূলক গান রচনা করার আদেশ করে। পুলিশ ও কংগ্রেসের অত্যাচার সত্ত্বেও জগা তার শিল্পী সঙ্গিদের উদ্দেশ্যে বলে—

'লাথিই মারুক আর খাতায় কারুক হামাদের গান বন্ধ হবে না। কেউ আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারবে না।'[৭৬]

কিন্তু বাকিরা প্রশাসনের ভয়ে পিছিয়ে পড়ে সাময়িকভাবে। কপিল সরকারি অফিসে চাকরি করে। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে তার চাকরি যেতে পারে। শীতল ও মন্টু মারধর আইনি জটিলতা ও কারাবাসকে ভয় পায়। এমনকি নানা পর্যন্ত বলে—

> '...কি দরকার বাপু ইসব ঝামেলায় গিয়া? এই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ আড়শুলা, টিকটিকি, রং বদল গিরগিটি হয়্যা দিব্যি মরা মাগুরের মত জীবন যাপন করছে, উয়াদের মত থাকলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'[৭৭]

পরক্ষণেই জগার দৃঢ় চরিত্র ও দৃপ্ত কথায় পুনরায় তারা পালাগানে যোগ দেয়। পুনরায় তারা জরুরি অবস্থার কঠিন বাস্তবতাকে নিজেদের পালায় তুলে ধরে। কিন্তু বাকিদের চরিত্র জগার মতো বলিষ্ঠ নয়। ফলে প্রাণের ভয়, হাজতবাসের ভয় তাদের বারবার মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটায়। সরকার বিরোধিতার জন্য বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয় তাদের প্রতিনিয়ত। শুধু মাত্র এভাবে সরকার বিরোধিতার জন্য তাদের কেউ গান করাতে কেউ ডাকে না। সব রকম সরকারি অনুদান থেকে তারা বঞ্চিত। অন্যদিকে রতন ট্যারার দল জরুরি অবস্থার সময় সরকারের পক্ষে গান রচনা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। এমনকি সরকার তাদের নানা পুরস্কারে ভূষিতও করে চলেছে। অথচ জগার দল মানের দিক থেকে অনেক উঁচু। কিন্তু তাদের ভাগ্যে জুটে কেবল নির্যাতন। সেজন্য শীতল, কপিল বারবার জগাকে মত পাল্টানোর কথা বলে। ফলে তাদের মধ্যে বাঁধে সংঘাত। এমন সময়ে নানা ঝাঁজিয়ে বলে উঠে—

> '...ঘরের কাজিয়া ঘরে হবে। বাবুরা গান শুনতে এসেছে আর তোমরা চোপা করছ? ছিঃ ছিঃ, এই উঠ—শুরু কর—মারব ত্রিশুলের খুঁচা—কই দেরি হচ্ছে কেন? উঠ—'[৭৮]

ফলে কোন্দল ছেড়ে পুনরায় জগা, কপিল, মন্টু, শীতল পালাগানে প্রবেশ করে। এবার জগা অভিনয় করে স্বৈরাচারী শাসকের ভূমিকায়। স্পষ্ট করে বললে দাঁড়ায় ইন্দিরা গান্ধির ভূমিকায়। নানা হয়ে ওঠে ভারতের অভিভাবক তথা বিচার ব্যবস্থা। পূর্বে আলোচনা করেছি জরুরি অবস্থার মূল কারণ হিসেবে সাধারণত চিহ্নিত করা হয়ে থাকে 'রাজনারায়ন

মামলা'-র কথা। এই মামলা থেকেই নাটকের গম্ভীরা পালার কাহিনির পরবর্তী অংশ শুরু। নানা জগাকে বলে—

> '...এই শোনার ভারতে কোন অন্যায় কোন অবিচারই হামি হতে দিব না, বরদাস্ত করব না। ন্যায় বিচারই হামার ধর্ম।...তার প্রমান—হামার বিধানে, তুমি স্বৈরাচারী শাসক। ভোট যুদ্ধে অন্যায়ভাবে প্রশাসনকে কাজে লাগানোয় তোমার নির্বাচনে জয়লাভ আইনত বাতিল।'[৭৯]

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় থেকে বাঁচার জন্যই শেষ পর্যন্ত দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে ইন্দিরা গান্ধি। সংবাদপত্রের উপর চাপে সেনসরশিপ। সংবিধানের একাধিক সংশোধনের ফলে গণতন্ত্রকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়। জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে দেশে এক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে তৎকালীন সরকার। এই সময় সঞ্জয় গান্ধির ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছিল। নাটকে সেই কথাও নাটককার তুলে ধরেছেন। কিছু সংলাপ তুলে ধরে বিষয়টি বিশদ করা যেতে পারে। মণ্টু হয়েছে সঞ্জয় গান্ধি—

> 'মন্টু : (যুবরাজের দম্ভে) হামি বুলি কি—হাজ্জার হাজ্জার লোক ভাড়া কর্য়া আনে, সরকারি কর্মিদের সিভিল ড্রেসে হাজির কর্য়া, গদ্দি ধর্য়া রাখার সমর্থনে বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশের লবাবদের দিয়া এক্ষুনি বলাতে হবে--হামরা তোমার পাশে আছি।
>
> ...
>
> সব ব্যবস্থা হামি করছি। আগে ঘরের কাগজগুলার গলা টিপ্পে বিরুদ্ধে লেখা বন্ধ করতে হবে।
>
> ...
>
> কপিল : দেশে—জরুরী অবস্থা ঘোষণা কর্য়া, মশলা মুড়ির মতো ঝাঁকিয়ে, সবকিছু ক্যাচাল করে দেন।

জগা : (নানার সামনে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা)—হে ধম্মাবতার, তুমি হামাকে অনুমতি দাও।–হে ধম্মাবতার। তুমি আমাকে আলো দ্যাখাও।–হে ধম্মাবতার তুমি আমাকে ঈশ্বর বানাও।

নানা : (আশীর্বাদ করে) সংবিধান সংশোধন। গণতন্ত্র হজম। বিশ দফা প্রজনন। জননেন্দ্রিয় খতম।

...

বাম হাতে দ্যাও মদের বোতল, ডান হাতে বোম। মুখে বুলি আওড়ায়—বন্দেমাতরম।'[৮০]

এরপর শুরু হয় নির্বিচারে গ্রেফতার। এই গ্রেফতারের মিছিলকে নাট্যকার ভালোভাবেই ব্যঙ্গ করেছেন মন্টুকে সরকারি উকিল এবং কপিল ও শীতল ক্রমান্বয়ে প্রহরী ও সাধারণ মানুষ বানিয়ে। যেমন, ছেলে চাকরি না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে তার জন্য কারাদণ্ড, মুক্তি সূর্যকে প্রণাম না করে আকাশে সূর্যকে প্রণাম করার অপরাধে কারাদণ্ড, 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণের জন্য কারাদণ্ড ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে ভেজাল ওষুধ খেয়ে সাধারণ মানুষের প্রাণনাশ হলে ওষুধ কম্পানির মালিককে 'দেশ-বিভূষণ' উপাধি দেওয়া হয়েছে। কারণ তাতে দেশের জনসংখ্যা কমেছে। এখানে জগার মুখে যে গান শুরু হয় তাতে জরুরি অবস্থায় দেশের মানুষের কণ্ঠরোধের কথা উঠে এসেছে—

'নানা মুখ ব্যান্‌হা মারছ হে

এ ক্যামুন তোমার সুবিচার।

আবার উচিৎ কথা, বলব্যার আজকে

নাইখো হামাদের অধিকার।।

গণতন্ত্রের গর্ব করো

সেবার নামে ছোড়া—

স্বৈরতন্ত্র গড়তে তোমার

নাইখো কোন জোড়া।

...

আবার উচিৎ কথা, বলব্যার আজকে

নাইখো হামাদের অধিকার।

নানা মুখ ব্যান্‌হা মারছ হে

এ ক্যামুন তোমার সুবিচার।।'[৮১]

নাটকের অন্তিমে বীভৎস ডাইনি বেশি একজন চাবুক হাতে নানাকে আক্রমণ করে এবং নানা রেহাই পেতে মঞ্চ ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন জগা, মন্টু, কপিল এবং শীতল গম্ভীরার অভিনয় ছেড়ে পুনরায় ফিরে আসে তাদের বাস্তব জীবনে। পুনরায় তাদের একে অপরের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়। কারণ জরুরি অবস্থায় সরকারের দমননীতির করালগ্রাস তাদের জীবনে এসে পড়েছে। সরকার বিরোধিতার জন্য তাদের নেই তেমন ইনকাম। আবার আছে পুলিশ ও মাস্তানের ভয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জগা চায়না সরকারের দালালি করতে। চায় না সরকারের হয়ে গান বাঁধতে। উপার্জন না হলেও সে নিজের আদর্শ ত্যাগ করে না।

উত্তর মেলে না :

জরুরি অবস্থায় মধ্যবিত্ত জীবনে যেসব সংকট প্রবল আকার ধারণ করেছিল সেগুলি অবলম্বন করে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্তর মেলে না' একাঙ্কটি রচনা করেন। নাটকটিতে বাড়ির কর্তা একটি প্রাইভেট ফার্মের কর্মচারি, ছেলে খোকা গ্রাজুয়েট ও বেকার, বাড়ির মেয়ে খুকু পড়াশুনা করছে এবং তার বিয়ের জন্য দেখাশুনা চলছে কিন্তু বারবার পাত্রপক্ষের কাছ থেকে তাকে প্রত্যাখ্যাত হতে হচ্ছে।

নাটকের কাহিনি অংশে দেখা যায়, খুকুকে দেখতে ৩৩ নং ছেলেপক্ষর লোক আসবে সেজন্য চলছে ব্যবস্থাপনার তোরজোড় এবং দেশে চলছে জরুরি অবস্থা। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে খোকার চলছে তরজা। তরজার সংলাপে উঠে আসে সেই সময়ের

পরিস্থিতি। যেমন বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজে রয়েছে চাকরির হাহাকার। সেজন্য খোকার ও তার বন্ধুদের বিয়ে করার বয়স ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা করতে পারছে না। যারা সি. পি. আই (এম) পার্টি করে তাদের বিরুদ্ধে চলছে পুলিশি অভিযান—হয় তারা গ্রেপ্তার হচ্ছে, নয় পুলিশের গুলিতে মারা যাচ্ছে। কিন্তু বাড়ির লোক খোকাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত, কারণ খোকা কোনও রাজনৈতিক সংগঠনে যুক্ত নয়। কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় বাড়িতে ছেলেপক্ষের অতিথিদের আতিথেয়তা করার জন্য খোকাকে কিছু মিষ্টি-খাবার আনতে পাঠানো হয়। তার আসতে অতিরিক্ত দেরি হওয়ায় বাড়িতে সকলে উদ্বিগ্ন। অবশেষে জানা যায় ভুল সন্দেহে পুলিশ খোকাকে গুলি করে মেরেছে।

নাটককার এখানে দেখিয়েছেন মানুষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও রাজনৈতিক হিংসা থেকে দূরে থাকতে পারেনা। রাজনৈতিক ক্ষমতার আস্ফালন বহু অরাজনৈতিক প্রাণও নিয়ে নিতে পারে। সুতরাং স্বৈরাচারী শাসকের থেকে দূরে নয় তাদের প্রতিবাদ করার দিকেই সাধারণ মানুষকে ইঙ্গিত দেন নাটককার। এই কথাই বলেন নাটকের অন্যতম রাজনৈতিক চরিত্র রজত যখন খোকার বাবা বলেন রাজনীতি না করেও কেন খোকাকে মরতে হল।—

> '...এ প্রশ্নের উত্তর চান আপনাদের মুক্তি সূর্যের কাছে। জিজ্ঞাসা করুন—কেন কোন রাজনীতি না করেও আপনার ছেলেকে পুলিশের গুলিতে মরতে হল? কেন শুধু নাটক ভালবাসার অপরাধে প্রবীর দত্তকে পুলিশের লাঠি খেয়ে মরতে হল? কেন শুধু জর্জ ফর্ণাণ্ডেজের পরিচিত বলেই জেলের অন্ধকার ঘরে তিল তিল করে অভিনেত্রী স্নেহলতাকে মরতে হল বিনা চিকিৎসায়?'[৮২]

দেশটা যখন কারাগার :

জরুরি অবস্থার একটি রাত অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'দেশটা যখন কারাগার' (১৯৭৮) একাঙ্কটির পটভূমি। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে কাহিনিতে আবর্তিত হয়ে সমকালীন রাজনীতির জটিল পরিস্থিতি এখানে বর্ণিত। সত্তরের কাছাকাছি বয়স্ক অম্বরবাবু স্বদেশি যুগের লোক। তার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মহাত্মা গান্ধি, সুভাষ বসু, জহরলাল নেহেরুর

ছবি। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকায় দশ বছর কারাবাসও করেছিল পরাধীন ভারতবর্ষে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করা অম্বরবাবু যখন দেখল কেবলমাত্র নিজের গদি বাঁচানোর জন্য ইন্দিরা গান্ধি দেশকে একটি জেলখানায় পরিণত করেন। সাধারণ নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেয় সরকার জরুরি অবস্থার সময়। নাটকটির উপজীব্য হিসেবে সেগুলিই বিধৃত হয়েছে।

নাটকের কাহিনি অংশে দেখা যায়, অম্বরবাবুর ছেলে বিজয় তাদের পত্রিকা 'বিদ্রোহী'-র লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত। সে মনের দিক থেকে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন। তার বাবাকে বলতে দ্বিধাবোধ করে না—

> '...তোমরা যে স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছ—জেল খেটেছ—সত্যাগ্রহ করেছ—আমি কিন্তু সেটাকে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে স্বীকার করে নিতে পারি না।...তোমাদের মত কিছু লোক হয়ত ছিল যারা নেতাদের আদেশই শুধু পালন করেছ, কিন্তু সেই আন্দোলনের পেছনে একদল নেতা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তারা চেয়েছিল 'কমপ্রমাইস উইথ দ্য ব্রিটিশ' এবং ভারত দ্বিখণ্ডিত করে গদী দখলের চেষ্টা।...স্বাধীনতার ফলশ্রুতি হিসেবে যে জাতীয়তাবোধ জাতীর জীবনে বড় হয়ে দেখা দেওয়ার কথা—সেই জাতীয়তাবোধ, তোমাদের ঐ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও কি সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে জাগাতে পেরেছো?'[৮৩]

এমন সময় দুজন সি. আর. পি. সহ থানার ও. সি. সরোজ হাজরা বিজয়কে গ্রেপ্তার করতে আসে। কারণ বিজয় 'বিদ্রোহী' কাগজে ইন্দিরা গান্ধির রাজনীতির সমালোচনা করে 'দেশ এখন একনায়কত্বের পথে এগুচ্ছে' নামে একটি কলাম লিখেছে। তার উপর অভিযোগ চাপানো হয়েছে যে, সে জরুরি অবস্থার অবমাননা করেছে, ফ্যামিলি প্লানিং বানচাল করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে উস্কানি দিয়েছে। কিন্তু বিজয়দের মতো লেখকদের শাসকরাও পাশে চায়। কারণ তাদের খুরদার লেখনই পারে শাসকের স্বৈরশাসনকে সুশাসন বলে প্রচার করতে। সেজন্যই পুলিশ যখন বিজয়কে গ্রেপ্তার করে যাবে তখন কংগ্রেসের এম. এল. এ. জগদীশ সেখানে আসে তাদের রক্ষাকর্তার মুখোশ পরে। বিজয়ের উদ্দেশ্যে তার সোজা বক্তব্য, সরকারের বিরুদ্ধে কোনও কিছু লেখা যাবে না;

বরং লিখতে হলে ইন্দিরা গান্ধির বিশ দফা ও সঞ্জয় গান্ধির পাঁচ দফা কর্মসূচির পক্ষে বা ফ্যামিলি প্লানিং যে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই কথার সমর্থনে লিখতে হবে। তার এই প্রস্তাব অম্বর ও বিজয় দুজনেই অস্বীকার করে। তখনই বেরিয়ে আসে জগদীশের আসল চেহারা। আপোষে মীমাংসা করা না গেলে জগদীশ রীতিমতো হুমকি দেয় বিজয়কে জেলবন্দি করার, অম্বরের পেনশন বন্ধ করার। তাদের এই স্বৈরাচারী রূপ দেখে স্বাধীনতা সংগ্রামী অম্বরবাবুও সংকল্প নিয়েছে—এর বিরুদ্ধে সে পুনরায় সংগ্রামে নামবে, দেশজুড়ে জনমত তৈরি করে এই শাসনের উৎখাত করবে।

এমন সময় তাদের বাড়িতে সুকান্ত পালিয়ে আসে। যে একসময় নকশাল করত। তাকে আটক করতে সরোজ তাদের বাড়ি গেছে। তার মা বাবাকে হেনস্তা করছে। এসব কথা শুনে অম্বরবাবু চরম হতাশ হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার জন্য সমস্ত সংগ্রামই এখন তার কাছে ব্যর্থ মনে হচ্ছে। পুলিশ সুকান্তকে পেলেই চরম কিছু ঘটাতে পারে সেই সন্দেহ বিজয় আগেই করতে পেরেছিল। তাই পুলিশ আসার আগেই তাকে বাথরুমে লুকিয়ে দেয়। এরপর সরোজ পুনরায় এখানে আসে—কারণ জগদীশের প্রস্তাবকে বিজয় ও অম্বর অস্বীকার করেছে। জগদীশের মতো নেতারাই জরুরি অবস্থার সময় ঠিক করে দিত এলাকায় কাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অম্বর এখানে একটি ভুল করে ফেলে—সে সরোজকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে সুকান্তর বাড়ির অত্যাচারের প্রসঙ্গ উচ্চারণ করে ফেলে। আর বুঝতে বাকি থাকল না যে, সুকান্ত এখানেই গা-ঢাকা দিয়ে আছে। সেজন্য তারা বাড়ি তল্লাসির সিদ্ধান্ত নেই। এই সময় দেশে 'মিসা' আইন বলবৎ। তাই অম্বর সার্চ ওয়ারেন্ট চাইলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সরোজ বলে—

> '...ওসব নিয়ম কানুন উঠে গেছে। এখন আমাদের সন্দেহ, আমাদের হুকুমই যথেষ্ট। জরুরি অবস্থায় আমাদের ক্ষমতা এখন তুঙ্গে। আমি ইচ্ছা করলে যাকে খুশি মিসায় অ্যারেস্ট করতে পারি। আবার কুকুরের মত গুলি করে ফুটপাথে ফেলে রেখে দিতে পারি।'[৮৪]

শেষ পর্যন্ত সুকান্তকে তারা খুঁজে বার করে সেখানেই গুলি করে হত্যা করে এবং বিজয়কে গ্রেপ্তার করে।

এই নাটকটিতে মূলত দেখানো হয়েছে, যে স্বৈরাচারী শাসনের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে দীর্ঘকাল ধরে দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাল সেই দেশ পুনরায় স্বৈরাচারী শাসকের হাতেই পড়ল। সেজন্যই নাটকের শেষে অম্বর দেওয়ালে টাঙানো গান্ধিজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্রের ছবিগুলি দেখে আক্ষেপ প্রকাশ করেছে।

ঢাকের বাদ্যি :

জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর দেশের যাবতীয় সংবাদ মাধ্যমকে শাসক কংগ্রেস যেভাবে নিজেদের এজেন্ডা প্রচারের কাজে লাগিয়েছিল সেই বিষয়কে অবলম্বন করে অসীম মৈত্র রচনা করেন 'ঢাকের বাদ্যি' একাঙ্কটি। নাটককার প্রথমেই জানিয়েছেন—

> 'মনে রাখতে হবে—১৯৭৪ সালের রেলধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরে, জরুরী অবস্থার আগে এবং পরে আকাশ বাণী এবং অন্যান্য প্রচার সংস্থার যে নির্লজ্জ ভূমিকা আমাদের বিরক্তি ও পীড়া উৎপাদন করেছিল, তারই ফলশ্রুতি এই নাটকটি সেই সময়েই লেখা হয়েছিল কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তখন অভিনীত বা প্রকাশিত হয়নি।'[৮৫]

নাটকটির পটভূমি রচিত হয়েছে পাংশুপুর নামক এক রাজ্যে। এই পাংশুপুর আসলে জরুরি অবস্থার ভারতবর্ষ। নাটকের সূত্রধার ঢাকি প্রথমেই তার গানে পাংশুপুরের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেছেন।–

> 'পাংশুপুর নামে এক আছে মহাদেশ,
>
> প্রজারা পায়না খেতে তবু আছে বেশ।
>
> রাজার প্রবল তেজ, যেন তেজপাতা,
>
> মহামন্ত্রী আসল যন্ত্রী ঘোরান তিনি যাঁতা।
>
> রাজার নামে মহামন্ত্রী চালান শাসনকার্য
>
> যথা ইচ্ছা তথা করেন, না হয় বিচার্য।।

অতিষ্ট হইয়া তবে ক্ষেপে প্রজাগণ,

মহা আইন জারী হৈল করিতে দমন।

একদিকে চলে দেশে প্রজা উৎপীড়ণ

অন্যদিকে প্রচার হ'ল—হ'চ্ছে উন্নয়ন।।'[৮৬]

নাটকের কাহিনি অংশে দেখি, রাজ্যের মহামন্ত্রী তার তোষামদকারী অমাত্য, প্রতিহারী ও মন্ত্রী দ্বারা বেষ্টিত। যারা সর্বদাই মহামন্ত্রীর স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তকে পরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইত্যাদি বলে স্তুতি গান করে। মহামন্ত্রীও সেই বিষয়টা উপভোগ করতে ছাড়ে না। প্রজাদের ক্ষোভ দমন করতে বর্তমানে রাজ্যে মহা আইন অর্থাৎ জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে এবং এই মহা আইন যে বর্তমানে রাজ্যের একমাত্র রক্ষাকবচ সেই কথা জনগণকে বিশ্বাস করাতে হবে। আর সেই কার্যে সিদ্ধি লাভ করার জন্য মহামন্ত্রী দুটি পন্থার নির্দেশ দেন—প্রথমত, মহামন্ত্রীর সমস্ত কার্যক্রম এবং নির্দেশবাণী প্রচারের মাধ্যমে জনগণের অন্তরে গেঁথে দিতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, যদি জনগণ তা অমান্য করে তাহলে ভক্তবাহিনী অর্থাৎ সরকারের আশ্রিত গুন্ডাদের দিয়ে বলপ্রয়োগেও বাধা নেই। মহামন্ত্রীর এই প্রচার কার্যে বিশেষ সহায়ক আধুনিক তিনটি মাধ্যমকে প্রচার মন্ত্রী নিয়ে এসেছেন।—

১. খবরের কাগজ—সংবাদপত্রের উপর নির্দেশ জারি করা হয়েছে মহামন্ত্রীর এবং তার কর্মসূচির গুণগান ছাড়া যেন অন্যকিছু প্রচার না করা হয়। মহা আইন জারির ফলে দেশের অভূতপূর্ব উন্নতি হচ্ছে এটা বিশেষভাবে প্রচার করতে হবে। আর রাজ্যবাসীর মানসিকতা ভিন্ন পথে চালিত করার জন্য কিছু সস্তা, বানানো এবং মুখোরোচক অথচ বিভ্রান্তিকর খবরের প্রচারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. 'পাংশুবাণী' (অর্থাৎ আকাশবাণী)—পাংশুবাণীর সমস্ত অনুষ্ঠান সূচি বাতিল করে কেবলমাত্র মহামন্ত্রীর কর্মসূচি এবং তার বাণী প্রচার করা। খ্যাত, অখ্যাত ও কুখ্যাত নাট্যকার, শিল্পী, ভাষ্যকারদের দিয়ে ফরমায়েশি কথিকা, নাটক, সংগীত ইত্যাদির সাহায্যে রাজ্যের উন্নতির কল্পচিত্র তুলে ধরা হবে।

৩. দূরদর্শন—সাধারণ প্রজাদের জন্য সরকারি খরচায় স্কুল, কলেজ, ক্লাব ও সমবায় সমিতিতে কিছু টি. ভি. দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাহায্যে রাজ্যের উন্নতির চিত্র এবং মহামন্ত্রীর কর্মসূচি কৌশলে প্রচার করা হবে।

এগুলি ছাড়াও মহামন্ত্রী নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে আরও বেশ কিছু পন্থার কথা বলেন। যেমন, এল. এস. ডি., ম্যানড্রেক্স, ম্যারিজুয়ানা ইত্যাদি নেশার দ্রব্য দিয়ে ভক্তবাহিনীকে আচ্ছন্ন রাখতে হবে। যাতে তারা ভিন্ন কোনও কথা চিন্তা করতে না পারে। শিক্ষাব্যবস্থাকে সুকৌশলে ধ্বংশ করতে হবে। সারা বছর উৎসব, মেলা, জলসা ইত্যাদির মাধ্যমে যুব সমাজকে মাতিয়ে রাখতে হবে। এবং তার সঙ্গে যুব সমাজের মধ্যে বিভেদপন্থা প্রয়োগ করতে হবে।

কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও মহামন্ত্রী নিজের ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি। নাটকের শেষে দেখা যায়, আসল সত্য সাধারণ মানুষ ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরে মহামন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চার দিক থেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জনতার বিদ্রোহের আগুনে মহামন্ত্রী ও তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে।

এখানে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে রচিত ও পরিচালিত কিছু খ্যাত ও অখ্যাত নাটক তুলে ধরা হল। সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার চুড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল এই জরুরি অবস্থা। সমগ্র আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে, জরুরি অবস্থার সময়েও নাটক হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের হাতিয়ার। আমরা দেখেছি সেই প্রতিবাদ করতে গিয়ে বার বার আক্রান্ত হতে হয়েছে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীকে। তবে নাটক যেহেতু শিল্প-সাহিত্যের অংশ, সেহেতু নাটক রাজনীতির সঙ্গে যতই জড়িত হোক না কেন, তাকে নাটক হয়ে উঠতে হবে। যার বিচার করবে একমাত্র সময়। তার মধ্যে থাকবে কালোত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি। জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত সমস্ত নাটকগুলি যে সেই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়েছে তা বলা যাবে না। তবে 'লেনিন কোথায়?', 'এবার রাজার পালা', 'নরক গুলজার', 'নানা হে'-এর মতো নাটকও সেই সময়কে ধরে রচিত হয়েছে। যা আজও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হিসেবে অভিনয় করা যেতে পারে। আবার এই সময় 'উত্তর মেলে না', 'দেশটা যখন কারাগার', 'ঢাকের বাদ্যি' ইত্যাদির মতো কেবল প্রপাগাণ্ডা মূলক নাটকও রচিত হয়েছে। এগুলিতে

রাজনীতিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। শিল্পমূল্য নেই বললেই হয়। কিন্তু জরুরি অবস্থায় বসে, পুলিশের খবরদারিতে ও পোষা গুন্ডাদের চোখ রাঙানিতে যে তাঁরা এরকম নাটক লিখেছিলেন সেটা সাহসিকতার পরিচয় বহন করে।

তথ্যসূত্র:

১. চন্দ, পুলক; *এমার্জেন্সীয় অমাবস্যা ও আমাদের বুদ্ধিজীবীকুল*, প্রবন্ধসংগ্রহ : সাহিত্য সময় সমাজ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৮ পৃ-২৭৫

২. তদেব, পৃ-২৭৭

৩. সেন, সমর; *জরুরি অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক, পুলক চন্দ (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯১, পৃ-১০০

৪. তদেব, পৃ-২৭৬

৫. দত্ত, সন্দীপ; *ভারতীয় সংস্কৃতি নিগ্রহের ইতিহাস*, তাপস চক্রবর্তী (সম্পা.), ভারতীয় গণতন্ত্রের (?) স্বরূপ, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ. পি. ডি. আর.), কলিকাতা, সংযোজিত ও পুনর্মুদ্রিত, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ-৩৫ (পরিশিষ্ট-৯)

৬. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার*, নীহাররঞ্জন বাগ (অনুবাদ), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ-১২৩

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক (সম্পা.); *মুখবন্ধ*, উৎপল দত্ত, ম্যাকবেথ (ভাবানুবাদ), থীমা, কলকাতা, ২০১৮, পৃ-এক

৮. তদেব, পৃ-এক

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য; *উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার*, প্যাপিরাস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১২, পৃ-৬৬

১০. দত্ত, উৎপল; *লেনিন কোথায়?*, নাটক সমগ্র-৬, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৩, পৃ-১৫১

১১. তদেব, পৃ-১৭০

১২. তদেব, পৃ-১৭৫

১৩. তদেব, পৃ-১৮১

১৪. Mukherjee, Rudrangshu (edited); *Great Speeches of Modern India,* Random House India, New Delhi, 2007, Page- 310-311

১৫. বসু, নিমাইসাধন; *আমি : ইন্দিরা গান্ধী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ-৪১

১৬. দত্ত, উৎপল; *লেনিন কোথায়?*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৬

১৭. তদেব, পৃ-২১৫

১৮. চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন; *নাটক পরিচিতি*, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৩, পৃ-৬৫৫-৬৫৬

১৯. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার,* প্রাগুক্ত, পৃ-১২৪

২০. দত্ত, উৎপল; *এবার রাজার পালা*, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৩, পৃ-২২৯

২১. তদেব, পৃ-২৩০

২২. তদেব, পৃ-২৪৭

২৩. তদেব, পৃ-২৫৮

২৪. তদেব, পৃ-২৫৯

২৫. তদেব, পৃ-২৫৯

২৬. তদেব, পৃ-২৬২

২৭. তদেব, পৃ-২৬৪

২৮. তদেব, পৃ-২৬৪-২৬৫

২৯. তদেব, পৃ-২৭৫

৩০. তদেব, পৃ-২৭৭-২৭৮

৩১. তদেব, পৃ-২৮০

৩২. তদেব, পৃ-২৮১

৩৩. তদেব, পৃ-২৮১

৩৪. তদেব, পৃ-২৮৬

৩৫. তদেব, পৃ-২৯৩

৩৬. Marx, Karl and Frederick Engels, Manifesto of Communist Party, Selected Work, Progress Publishers, Moscow, 1968, Page-37

৩৭. দত্ত, উৎপল; *এবার রাজার পালা*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৩

৩৮. দত্ত, উৎপল; *সাদা পোশাক*, নাটক সমগ্র, নবম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৪, পৃ-২২৭

৩৯. তদেব, পৃ-২৩৫

৪০. তদেব, পৃ-২৯১

৪১. লেনিন, ভি আই; *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, অনিল কাঞ্জিলাল (অনুবাদ), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠদশ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ-৯

৪২. দত্ত, উৎপল; *সাদা পোশাক*, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৫

৪৩. তদেব, পৃ-২৫৭

৪৪. Kapoor, Coomi; *The Emergency: A Personal History*, Penguin Books, India, First Published, 2016, Page-5

৪৫. দত্ত, উৎপল; *সাদা পোশাক*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬৬-২৬৭

৪৬. তদেব, পৃ-২৭৫

৪৭. তদেব, পৃ-২৭৮

৪৮. তদেব, পৃ-২৭৯

৪৯. তদেব, পৃ-২৮৮

৫০. মিত্র, মনোজ; *নাটকসমগ্র,* তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২২, পৃ-৪৫৫

৫১. মিত্র, মনোজ; *নরক গুলজার,* নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২২, পৃ-৭২

৫২. তদেব, পৃ-৭৮

৫৩. তদেব, পৃ-৬১

৫৪. তদেব, পৃ-৭৩

৫৫. তদেব, পৃ-৭১

৫৬. তদেব, পৃ-৯২-৯৩

৫৭. তদেব, পৃ-৯৮

৫৮. তদেব, পৃ-১০৫

৫৯. রায়, অমল; *নিজবাসভূমে,* বজ্রনির্ঘোষের নাটক, উবুদশ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-১১৬

৬০. তদেব, পৃ-১১৬

৬১. তদেব, পৃ-১১৭

৬২. তদেব, পৃ-১১৯

৬৩. তদেব, পৃ-১২১

৬৪. তদেব, পৃ-১২২

৬৫. তদেব, পৃ-১২৫

৬৬. তদেব, পৃ-১২৮

৬৭. তদেব, পৃ-১৩১-১৩২

৬৮. তদেব, পৃ-১৪৬

৬৯. সাহা, নৃপেন্দ্র (সম্পা.); *গ্রুপ থিয়েটার*, দ্বিতীয় বর্ষ, শারদীয় ১৯৭৯ (১৩৮৬), পৃ-২৫৪

৭০. লাহিড়ী, দিব্যেশ; *নানা হে*, নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা.), গ্রুপ থিয়েটার, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শারদীয় ১৯৭৯, পৃ-২৫৬

৭১. তদেব, পৃ-২৫৯

৭২. তদেব, পৃ-২৬২

৭৩. তদেব, পৃ-২৬৪

৭৪. তদেব, পৃ-২৬৪

৭৫. তদেব, পৃ-২৬৪

৭৬. তদেব, পৃ-২৬৭

৭৭. তদেব, পৃ-২৬৭

৭৮. তদেব, পৃ-২৭০

৭৯. তদেব, পৃ-২৭০

৮০. তদেব, পৃ-২৭১-২৭২

৮১. তদেব, পৃ-২৭৫

৮২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল; *উত্তর মেলে না*, বোম্মানা বিশ্বনাথম্ (সম্পা.), সত্তর দশকের একাংক, নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ-৫৭

৮৩. চক্রবর্তী, অমলেন্দু; *দেশটা যখন কারাগার*, বোম্মানা বিশ্বনাথম্ (সম্পা.), সত্তর দশকের একাংক, নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃ-১২০

৮৪. তদেব, পৃ-১৩৫

৮৫. মৈত্র, অসীম; *ঢাকের বাদ্যি*, বোম্মানা বিশ্বনাথম্ (সম্পা.), সত্তর দশকের একাংক, নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ-১৪১

৮৬. তদেব, পৃ-১৪২